‘‘ইসলামী চেতনার কবি আহমাদ মুহাররাম ও ফররুখ আহমদ : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা’’

‘‘ইসলামী চেতনার কবি আহমাদ মুহাররাম ও ফররুখ আহমদ : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা’’

অভিসন্দর্ভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত

গবেষক

মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন

রেজিস্ট্রেশন নং: হ-৮৮/২০১৩-২০১৪

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. আ জ ম কুতুবুল ইসলাম নোমানী

সহকারী অধ্যাপক

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জামাদিউল উলা, ১৪৪০ হিজরী

জানুয়ারী, ২০১৯

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ২০১৩-২০১৪ শিক্ষা বর্ষের এম.ফিল গবেষক মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ''ইসলামী চেতনার কবি আহমাদ মুহাররাম ও ফররুখ আহমদ : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা'' শীর্ষক বিষয়ে এ গবেষণা সন্দর্ভটি সফলতার সাথে রচনা করেছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমি এই গবেষণা সন্দর্ভটির চূড়ান্ত কপি আদ্যন্ত পাঠ করেছি। এটি এম.ফিল (আরবী) ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

আমি তার সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।

তত্ত্বাবধায়ক
ড. আ জ ম কতুবুল ইসলাম নোমানী
সহকারী অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা দিচ্ছি যে, "ইসলামী চেতনার কবি আহমাদ মুহাররাম ও ফররুখ আহমাদ: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা" শীর্ষক গবেষণা সন্দর্ভটি একটি আমার মৌলিক গবেষণা কর্ম যা আমি নিজেই সম্পাদন করেছি। আমার জানা মতে ইত:পূর্বে কোথাও এই শিরোনামে এম.ফিল বা পিএইচ.ডি. গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি।

গবেষক
মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

أحمد محرم

ফররুখ আহমদ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা সেই সত্ত্বার যাঁর অশেষ মেহেরবানীতে আমি ''ইসলামী চেতনার কবি আহমাদ মুহাররাম ও ফররুখ আহমদ : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা'' শীর্ষক বিষয়ক গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত করতে পেরেছি। এ জন্য তাঁর শাহী দরবারে জ্ঞাপন করছি অসংখ্য শুকরিয়া। তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ ও জ্ঞানী গুনীদের সহযোগিতায় আমার এ গবেষণা কর্মটি সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেওয়া সহজ হয়েছে বলে আমি মনে করি। তাই যাদের সাহায্য সহযোগিতা ও আন্তরিকতায় আমার এ কর্মটি সম্পাদন করতে পেরেছি তাঁদের প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ। এ বিষয়ে আমি সর্বপ্রথম সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক মুহতারাম ড. আ জ ম কুতুবুল ইসলাম নোমানী এর কথা যিনি আমাকে এ কাজে সাহস ও সহযোগিতা যুগিয়েছেন এবং শত ব্যস্ততার মাঝেও নিজের মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমার প্রস্তুতকৃত পান্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করত: এর ভূলগুলো সংশোধণ করে দিয়েছেন; একে মার্জিত ও সমৃদ্ধ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।

আমার এ গবেষণা কর্মের দ্বিতীয় প্রেরণার উৎস হচ্ছেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান ড. এ.বি.এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী। যিনি আমার গবেষণা কর্মের শিরোনাম চূড়ান্ত করে দিয়েছেন। তাছাড়া তিনি আমাকে চয়নকৃত বিষয়ে গবেষণা করতে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে সাহস যুগিয়েছেন। এ গবেষাণাকর্মে তাঁর সৃজনশীল দিক নির্দেশনা আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে। আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে স্মরণ করছি আমার সম্মানিত শিক্ষক মন্ডলীর কথা, যারা আমার এ কর্মে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে প্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন। যখনই আমি আটকে গেছি তখনই ছুটে গিয়েছি তাদের কাছে এবং জেনে নিয়েছি আমার প্রয়োজনীয় বিষয়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউসুফ (চেয়ারম্যান), অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল কাদির, ড. যুবাইর মোঃ এহসানুল হক এম.এ.; পি এইচ.ডি (ঢাকা), সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, ড. মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, ড. মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম, ড. মুহাম্মদ নুরে আলম, ড. মুহা রফিকুল ইসলাম, ড. কামরুজ্জামান শামীম।

গুরুজনদের পাশাপাশি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই ও অভিভাবক ডা. মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন এম.বি.বি.এস., বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)-কে যার পিতৃতুল্য স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে তিনি আমাকে গড়ে তুলেছেন। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর দরবারে তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

এছাড়া যে সব গ্রন্থ ও প্রবন্ধ থেকে আমি তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছি সে সব লেখকের অবদানও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। আমি আরো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি বিভাগীয় সহকারীবৃন্দদের প্রতি যারা আমাকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে সাহায্য করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

গবেষক

তারিখঃ ১৪/০১/১৯ইং

মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
এম.ফি গবেষক-২০১৩

সূচীপত্র

প্রত্যয়ন পত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় : আহমাদ মুহাররামের জীবনী ১-৮

- ভূমিকা ১
- জন্ম ও পরিচয় ১
- শৈশবকাল ও শিক্ষা জীবন ২-৩
- কর্মজীবন ৩-৪
- তার স্বভাব প্রকৃতি ৪-৫
- ইন্তেকাল ৫
- অবদান ৫-৬
- তথ্যসূত্র ৭-৮

দ্বিতীয় অধ্যায় : আহমাদ মুহাররামের কবিতার বিষয়বস্তু ও ইসলামী চেতনার নানাদিক

প্রথম পরিচ্ছেদ : আহমাদ মুহাররামের কবিতার বিষয়বস্তু ৯-৩৪

- ভূমিকা ১০
- ইসলামী কবিতা ১০-১১
- সামাজিক কবিতা ১১-১২
- দেশাত্মবোধক কবিতা ১২-১৪
- রাজনৈতিক কবিতা ১৪
- বর্ণনামূলক কবিতা ১৪-১৫
- শোকগাঁথা কবিতা ১৫-১৬
- নাট্য কবিতা ১৬
- তথ্যসূত্র ১৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামী চেতনার নানাদিক

- ভূমিকা ১৮
- মুহাম্মদ (সা.) এর আগমন ও ইসলামী দাওয়াত ১৮-২০
- মহানবীর (সা.) হেরাগুহায় অবস্থান ও ওহী আগমন ২০
- দ্বীনের কেন্দ্র দারুল আরকাম ও ওমর (রা.) এর ইসলাম গ্রহণ ২১
- রাসুল (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র ও মদিনায় হিজরত ২১-২২
- আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ (সা.) ২২-২৪
- ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ ২৪-২৫
- মক্কা বিজয় ২৫-২৭
- ইসলাম ধর্মের কটুক্তিকারী লর্ড ক্রোমারের বক্তব্যের জবাব ২৭-২৮
- ইসলামের উপর অটল থাকার আহবান ২৯
- ইসলাম ধর্মের প্রশংসায় কবির বক্তব্য ২৯-৩০
- মুসলিম ঐক্যের প্রতীক তুর্কি খেলাফতের প্রশংসা ৩০-৩২
- ইসলামী সভ্যতা ৩২-৩৩
- তথ্যসূত্র ৩৪

তৃতীয় অধ্যায় : ফররুখ আহমদের জীবনী ৩৫-৪৪

- ভূমিকা ৩৬
- জন্ম ও বংশ পরিচয় ৩৬-৩৭
- শিক্ষাজীবন ৩৭-৩৮
- পারিবারিক জীবন ৩৮-৪০
- কর্মজীবন ৪০
- তাঁর স্বভাব-প্রকৃতি ৪১-৪২
- তাঁর ধর্মীয় জীবন ৪২
- পুরষ্কার ও সম্মাননা ৪৩
- ইন্তেকাল ৪৩
- তথ্যসূত্র ৪৪

চতুর্থ অধ্যায় : ফররুখ আহমদের কবিতার বিষয়বস্তু ও ইসলামী ভাবধারার নানাদিক ৪৫-৬৭

প্রথম পরিচ্ছেদ : ফররুখ আহমদের কবিতার বিষয়বস্তু

- ভূমিকা ৪৬
- ইসলামী জাগরণমূলক কবিতা ৪৬
- ইতিহাস বর্ণনামূলক কবিতা ৪৭
- বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশ ৪৭-৪৮
- মানবতাবাদী আদর্শের রূপায়ন ৪৮-৪৯
- মুসলিম ঐহিত্যের বর্ণনা ৪৯-৫০
- তথ্যসূত্র ৫১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ফররুখ আহমদের কবিতায় ইসলামী ভাবধারার নানাদিক

- মহানবী (সা.) এর পৃথিবীতে আগমন ৫২
- ইসলামী ঐতিহ্য ও আদর্শ বোধে উদ্বুদ্ধ করণের আহবান ৫২-৫৬
- খোলাফায়ে রাশেদীনের স্তুতি ৫৬-৫৮
- কারবালার বিষাদময় ঘটনার বিবরণ ৫৮-৫৯
- মহানবী মুহাম্মদ (সা.) এর প্রশংসা বর্ণনা ৫৯
- মুসলিম মুনষিদের জীবনকথার বর্ণনা ৬০-৬১
- রমজান মাসের ফযীলত ও করণীয় প্রসঙ্গে ৬২-৬২
- হক ও বাতিলের পার্থক্য বর্ণনায় কবির কবিতা ৬২
- কাব্যে কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের মর্মবাণী ৬২-৬৩
- আল কোরআনের কাব্যানুবাদ ৬৩-৬৪
- ইসলামী সঙ্গীত বা মোনাজাত ৬৪
- উপসংহার ৬৫
- তথ্যসূত্র ৬৬-৬৭

পঞ্চম অধ্যায় : উভয় কবির ইসলামী চেতনার তুলনামূলক পর্যালোচনা ৬৮-১২৬

ক) আহমাদ মুহাররমের রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৬৯-৭২

খ) ফররুখ আহমদের রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ৭৩-৮৫

গ) 'দিওয়ানু মাজদিল ইসলাম' এবং 'সাত সাগরের মাঝি' ও সিরাজাম মুনীরা'- কাব্যেত্রয়ের উপর আলোচনা ৮৬-১১৯

ঘ) উভয়ের রচনাবলীর মাঝে বিদ্যমান ইসলামী চেতনার তুলনামূলক আলোচনা ১২০-১২৬

উপসংহার ঃ ১২৭

গ্রন্থপুঞ্জি ঃ ১২৮-১৩২

ভূমিকা

আরবী ও বাংলা সাহিত্যে ইসলামী সাহিত্যের সূত্রপাত সাহিত্যদ্বয়ের সূচনালগ্ন থেকেই। আরবী সাহিত্যে আহমাদ মুহাররাম ও বাংলা সাহিত্যে কবি ফররুখ আহমদ ছিলেন স্ব-স্ব সাহিত্যে মৌলিক প্রতিভাধর শক্তিমান কবিদের অন্যতম। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাদের অবদান থাকলেও ইসলামী ভাবধারায় সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তাঁরা সর্বাধিক পরিচিত। এ জন্য আহমদ মুহাররাম কে বলা হয় 'আরবত্ব ও ইসলামের' কবি অন্যদিকে ফররুখ কে বলা হয় 'মুসলিম রেনেসাঁর কবি।

তাঁরা উভয় দৃঢ়ভাবে ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন এবং একনিষ্ঠতার সাথে জীবন ও কর্মে এর প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন আল্লাহ প্রদত্ত জীবনাদর্শ ইসলামই মানবজাতির সকল সমস্যার সুষ্ঠ ও সুন্দর সমাধান দিতে সক্ষম। এতে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষের মুক্তি ও কল্যাণ সুনিশ্চিত। এ কারণে আহমাদ মুহাররাম তৎকালীন আরব উপনিবেশের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন এবং ইসলাম ও আরব জাতীয়তাবাদের পক্ষে কলম চালিয়েছেন। পক্ষান্তরে কবি ফররুখ ছিলেন ইসলামের পুনর্জাগরণ, মুসলিম নবজাগরণ, মুসলিম ঐতিহ্য ও মানবতাবাদের বলিষ্ঠ প্রবক্তা।

কবিতা সব ভাষারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। যে কোন ভাষা সৃষ্টির পর পরই কবিতার সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর যে সমস্ত ভাষার আদিরুপ নির্ণয় করা যায় এবং আদিরুপ থেকে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হবার ক্রমধারাগুলো সর্বাংশে আবিষ্কার করা যায় আরবী ও বাংলা ভাষা তাদের মধ্যে অন্যতম। পৃথিবীর সকল দেশের ভাষার মত আরবীতে সাহিত্য হিসেবে যেমন কবিতার উদ্ভব হয় তেমনি বাংলা সাহিত্যেও এর ব্যতিক্রম নয়। মরুভূমির রূক্ষ জীবনের ঝড় ঝাপটার যখন দেহ-মন ক্লান-শ্রান্ত হয়ে পড়ে, দীর্ঘ অন্বেষনের পর নির্ঝর ও তৃণভূমির সন্ধান পেয়ে অন্তরে যখন কিছুটা শান্তির ছোঁয়া লাগে, তখন স্বাভাবিক ভাবেই সে আবেগ ও অনুভূতি ভাষার অবলম্বনে প্রকাশ পেতে আকুলি বিকুলি করে। এভাবে হয়ত আরবী কবিতার অভ্যুদয় হয়।[১] পক্ষান্তরে আবহমান কাল থেকে গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্য, পাহাড় ঘেরা নৈসর্গিক পরিবেশের বর্ণনা দিয়ে বাংলা কাব্যের সূত্রপাত।

আরবী ও বাংলা সাহিত্যের একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে ইসলামী কবিতা। কিন্তু এরও একটি ক্রমধারা আছে, বাংলা সাহিত্যের শুরু থেকেই প্রায় প্রত্যেক মুসলিম কবিই ইসলামী সাহিত্য বিশেষ করে রাসুল-প্রশস্তিমূলক কবিতা, গান, কাব্য ইত্যাদি রচনা করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: শাহ মুহাম্মদ সগীর, সৈয়দ সুলতান, আব্দুল হাকিম, ফকির গরিবুল্লাহ, মুনসি মেহেরুল্লাহ, কাজী নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ আহমদ প্রমুখ।[২] নজরুলের পরে এক্ষেত্রে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কবি হলেন ফররুখ আহমদ।

ফররুখের ‘সাত সাগরের মাঝি’ ও ‘সিরাজাম মুনীরা’ কাব্যদ্বয় বাংলা সাহিত্যে ইসলামী সাহিত্যের এক অনুপম সৃষ্টি। পক্ষান্তরে আবরী ভাষায় ইসলামী কবিতার সূত্রপাত যারা করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম কা’ব ইবন যুহায়র, হাসসান ইবন ছাবিত, লাবীদ ইবনে রাবী’আ (রা.) প্রমুখ। এরা সকলেরই ইসলামের প্রাথমিক যুগের কবি ছিলেন। তাঁদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আরবী ভাষায় তখন ইসলামী কবিতা এক শক্তিশালী রূপে আবির্ভূত হয়েছে।[৩] এরপরে উমাইয়্যা যুগের কবিতায়ও ইসলামের প্রভাব ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। ইসলামের এ প্রভাব প্রত্যেক ধরনের কবিতায় কম বেশী দেখা যায়।[৪] এরপর আবাসী যুগ। এ যুগকে আরবী সাহিত্যের স্বর্ণ যুগ বলা হয়। ১৭৮৯ সালে নেপোলিয়ানের মিশর আক্রমণ ও তা দখলের ফলে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের জগতে এক নতুন দিক উন্মোচিত হয়। আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে এই অভিযানকে ‘আল-নাহ্দা’-রেনেসাঁর পটভূমি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ সময় থেকে আরবী সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূত্রপাত।[৫] এই আধুনিক যুগের নব্য প্রাচীন পন্থী কবি সম্প্রদায়ের অন্যতম হলেন আহমাদ মুহররাম। তাঁর কবিতায় ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও ইসলামী ভাবধারা বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে।

আরবী ও বাংলা সাহিত্যে যথাক্রমে আহমাদ মুহাররাম ও ফররুখ আহমদ ইসলামী ভাবধারা সম্পন্ন সাহিত্য বেশী রচনা করায় আমি ‘‘ইসলামী চেতনার কবি আহমাদ মুহাররাম ও ফররুখ আহমদ : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা’’ শীর্ষক অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে আগ্রহী হই। উল্লেখিত শিরোনামে আলোচ্য কবি ও তাঁদের কাব্যের ইসলামী ভাবধারা বিষয়ক সাহিত্য কর্মের নিখুঁত পর্যালোচনা না হলেও তাঁর স্বরুপ নির্ণয়ে কিঞ্চিৎ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি। এই অভিসন্দর্ভটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

প্রথম অধ্যায়ে আহমাদ মুহাররামের জন্ম, বংশ-পরিচয়, কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, তাঁর স্বভাব-চরিত্র ও অবদান সম্পর্কে আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আহমাদ মুহাররাম কাব্যে ইসলামী চেতনার নানা দিক যেমন মুহাম্মদ (সা.) এর আর্বিভাব, দ্বীন প্রচার, যুদ্ধ-বিগ্রহ, আধুনিক মিশরে ইসলাম সম্পর্কে কটুক্তিকারীদের দাতভাঙ্গা জবাব-ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ফররুখ আহমদের জন্ম, বংশ পরিচয়, কর্মজীবন, পারিবারিক জীবন, তাঁর স্বভাব-প্রকৃতি, ধর্মীয় জীবন, পুরষ্কার ও সম্মাননা এবং ইন্তেকাল ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে ফররুখ আহমদের কবিতায় ইসলামী জাগরণের নানাদিক নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে উভয় কবির সাহিত্যকর্মে ইসলামী চেতনার নানাদিক নিয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

এ বিষয়ে গবেষণার তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে আরবী সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রহন্থবলী, উভয় কবির স্বরিচত কাব্য গ্রন্থসমূহ এবং লেখকদ্বয়ের উপর লিখিত বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহ হতে। মূল আরবী ও বাংলা কাব্যংশ, অনুবাদ ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহে যে সব উৎসগ্রন্থ ও সূত্রের সাহায্য নেওয়া হয়েছে যথাস্থানে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

আমার জ্ঞান ও যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা, মানবীয় স্বভাবজাত ভূল-ত্রুটি এবং গবেষণার নিয়ম কানুন সম্পর্কে অপর্যাপ্ত জ্ঞান সত্বেও এ ক্ষুদ্র প্রয়াসের দ্বারা বাংলা ভাষাভাষী পাঠকবৃন্দ সামান্যতম উপকৃত হলে নিজের শ্রম সফল ও স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। মহান আল্লাহ এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

তথ্যসূত্র

১। আবু তাহির মোহাম্মদ মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬) পৃ. ৩২।

২। অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, ফররুখ প্রতিভা, (ঢাকা: ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন ও কথাশিল্প প্রকাশন, ২০১৭), ৩য় প্রকাশ, পৃ. ২৭১।

৩। ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, আসহাবে রাসূলের কাব্য প্রতিভা, (ঢাকা: আহসানিয়া পাবলিকেশন, ২০০৩), ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৪। ড. মুকতাদা হাসান আযহারী, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, সম্পাদক: ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান, (রাজশাহী: মুহাম্মদী সাহিত্য সংস্থা, ১৯৮৫), ২য় খন্ড, পৃ. ১০৭-১১০।

৫। ড. আহমদ আলী, আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস (চট্টগ্রাম: আল-আকিব প্রকাশনী, ২০০৪), ১ম খন্ড, পৃ. ১৬-১৭।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় : আহমাদ মুহাররামের জীবনী

- ভূমিকা
- জন্ম ও পরিচয়
- শৈশবকাল ও শিক্ষা জীবন
- কর্মজীবন
- তাঁর স্বভাব প্রকৃতি
- ইন্তেকাল

ভূমিকা

আরবী সাহিত্যের আধুনিক যুগে ইসলামী ভাবধারার বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিকদের একজন আহমাদ মুহাররাম। তিনি আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল কবি প্রতিভা। আরবী সাহিত্যে ইসলামী কাব্য সাহিত্য তাঁর পদচারণায় যেমন সমৃদ্ধশালী হয়েছে তেমনি তিনি হয়েছেন কালোত্তীর্ণ শিল্পী। যে সকল কবি সাহিত্যিক রাসূল (সা.) এর প্রশংসায় কবিতা রচনা করে চির অমর হয়ে আছেন তিনি তাদের অন্যতম। তিনি ইসলামী বিষয়ে বিশেষ পান্ডিত্বের অধিকারী ছিলেন। ইসলামী চিন্তা-চেতনায় সিক্ত হয়েছে তাঁর কাব্যের বিভিন্ন ক্ষেত্র। তবে ইসলামী বিষয়-ই মুহররাম কাব্যের একমাত্র বিষয় নয়। ঔপনিবেশিক শাসনামলে জন্ম নেওয়া কবিকে দ্বন্দ্বময় অস্থিতিশীল সমাজ-প্রবাহে কবিতায় বিদ্রোহের পতাকা উড়াতে দেখা যায়। ইসলামী বিষয়ের পাশাপাশি তাঁর কবিতায় প্রবল রূপে গীত হয়েছে জাতীয়তাবাদের জয়গান। তাই বলা যায় সাহিত্যের কালজয়ী আবেদন এবং গতিমান প্রাসঙ্গিকতার বিচারে তিনি শুধু স্বীয় যুগের-নন; বরং সকল যুগের কবি।

জন্ম ও পরিচয়

এই মহান কবির প্রকৃত নাম আহমাদ মুহাররাম ইবন হাসান আব্দুল্লাহ।[১] তিনি মিশরের রাজধানী কায়রোর দুলনজাত এর আবিয়া আল-হামরা নামক গ্রামে ১৮৭১[২] মতান্তরে ৫ মুহাররাম, ১২৯৪ হিঃ/২০ জানুয়ারী ১৮৭৭ শনিবার জন্ম গ্রহণ করেন।[৩] তিনি মুহাররাম মাসে জন্ম গ্রহণ করেন বিধায় তাঁর নাম আহমাদ মুহাররাম রাখা হয়।[৪] কারো কারো মতে তিনি ১২৯৪ হিজরীতে কায়রোর 'বা আল-উজির নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।[৫] অন্য মতে তিনি মিশরের বুহায়রা জেলার অর্ন্তগত 'আবিয়া আল-হামরা' নামক স্থানে ১৮৭৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন।[৬] তাঁর পিতার নাম হাসান আফিন্দী আব্দুল্লাহ। তিনি তুর্কী বা শারাকসী বংশোদ্ভূত ছিলেন।[৭]

শৈশবকাল ও শিক্ষা জীবন

জন্মের পর তিনি কায়রোর ''বা আল-উজির'' নাম পল্লীতে পিতৃগৃহে বেড়ে উঠতে থাকেন। কিন্তু তথায় তাঁর শৈশবকাল দীর্ঘায়িত হয়নি। পিতার সাথে শহরের অভিজাত এলাকা ছেড়ে বুহায়রা জেলায় ''আবিয়া আল-হামরা'' গ্রামে চলে যান। যেখানে তাঁর পিতা সাধারণ মানুষের ভূসম্পত্তি দেখাশুনা করতেন।[৮] বাল্যকালে তাকে মক্তবে ভর্তি করা হয় কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতি ভাল না লাগায় তথায় তাঁর অবস্থান দীর্ঘায়িত হয়নি। ফলে বাড়িতে তাঁর পিতার গ্রন্থাগারে প্রতি ঝুঁকে পড়েন।[৯] সেখানে আহমাদ মুহাররাম লেখাপড়া শিখেছেন, পবিত্র কুরআনের যৎসামান্য মুখস্ত করেছেন। তাঁর জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ বৃদ্ধি পেলে পিতা

তাঁর জন্য একজন আযহারী আলিম মনোনীত করলেন। তাঁর নিকট তিনি আরবী ব্যাকরণের নাহু সরফ ও সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন। তখন তাঁর বয়স ১২ বৎসর অতক্রান্ত হয়নি।[১০]

পিতা পুত্রের বইয়ের প্রতি অনুরাগ ও অধ্যয়নের তীব্র ঝোঁক লক্ষ্য করে বইয়ের সংগ্রহ ক্রমান্বয়ে বাড়াতে থাকেন।[১১] অন্যদিকে তাঁর সার্বক্ষণিক লাইব্রেরীতে অবস্থান ও পত্র-পত্রিকার প্রতি মনোযোগ তাঁর মাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তিনি পুত্রকে অর্থ উপার্জনের প্রতি মনোনিবেশ করাতে জোর প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু তাঁর অধ্যবসায়ের কাছে তিনি হার মানতে বাধ্য হন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর পিতা তাঁকে একটি মাদ্রাসায় ভর্তি করান এবং সেখানে আশানুরূপ শিক্ষা না পেয়ে তিনি মাদ্রাসা ত্যাগ করেন। অত:পর নিজ উদ্যোগে আব্বাসী যুগের খ্যাতনামা দু'জন কবি আল-মুতানাব্বী ও আল-বুহতুরী'র সমমর্যাদায় পৌঁছাবার ইচ্ছা পোষণ করেন। অধ্যয়নের জন্য তাঁর একটি বিশাল গ্রন্থাগার ছিল। সেখানে ধর্ম, সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শন সম্পর্কে মৌলিক গ্রন্থাবলী ছিল। তিনি ঐ গ্রন্থাগারে আত্মনিয়োগ করে পছন্দমাফিক জ্ঞানার্জনে সক্ষম হন। তিনি অবিরাম অধ্যয়নের ফলে সাহিত্য ইতিহাস ও ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করেন এবং কাব্যরচনার উচ্চাসনে পৌঁছাবার যোগ্যতা লাভে সর্মথন হন।[১৪] তিনি ১৫ বৎসর বয়সে সাংবাদিকতার প্রতি মনোযোগ দেন এবং সাংবাদিকতার উচ্চাসন লাভ করেন। রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধানের এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং এ ব্যাপারে তিনি বেশ কিছু কাজ করেন। কবি ও সাহিত্যিকদের আসরে তাঁর আলাপ-আলোচনা শুরু হয় এবং তারা তাঁকে পছন্দ করেন। তিনি ১৮ বছর বয়সে ঐতিহাসিক ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থাবলী লিখতে মনোযোগী হন। তাঁর গভীর আগ্রহ ও উচ্চাভিলাষের ফলে এক্ষেত্রেও তিনি খ্যাতি লাভ করেন।[১৫]

কর্মজীবন

তিনি চাকুরি অপছন্দ করতেন।[১৬] বিশেষ করে সরকারী চাকুরি হতে বিরত ছিলেন। কারণ তিনি মনে করতেন সরকারী চাকুরি তাঁর উচ্চাভিলাষের ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় অন্তরায়। তাতে বাক স্বাধীনতার বিঘ্ন ঘটে।[১৭] তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় ''দামাহুর'' শহরে অতিবাহিত করেন এবং জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের পক্ষে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেন। সরকারী প্রশাসন ও তার নৈকট্য হতে তিনি দূরত্ব বজায় রাখেন। দামানহুরে প্রকাশিত ''আস-সিদক'' নামীয় পত্রিকাটি সাহিত্যের অঙ্গনে উন্নত সাহিত্য পত্রিকা বলে গণ্য হত। সেখানে তিনি একটি সাহিত্য সংখ্যা প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে নবাগত কবিগণ আগমণ করতেন। তিনি তাদেরকে সহজ পদ্ধিতির মাধ্যমে শিক্ষা দিতে, সাহিত্যক গবেষণা ও সমালোচনামূলক মতামত ব্যক্ত করে লিখতেন।[১৮]

কবি আহমাদ মুহররাম সকল কর্মে বিশ্বস্ত, জাতির জন্য নিবেদিক ও কাব্য রচনায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর প্রজ্ঞা ও প্রতিভা তাঁকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে কর্মব্যস্ত রেখেছিল। তিনি দর্শন ও সাহিত্যের প্রাণবন্ত পরিবেশে আগমন করেন, তবে বার্ধক্য তাঁকে দার্শনিক ও সাহিত্যিক চিন্তা-চেতনায় অগ্রসর হতে সুযোগ দেয়নি।[১৯]

যেহেতু তাঁর পিতা ''দামানহুর'' শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন।[২০] সেহেতু তিনিও জীবনের অধিকাংশ সময় তথায় অতিবাহিত করেন।[২১] তিনি দামানহুরে অবস্থানকালে প্রায়শ তাঁর বাড়িতে কবিদের আসর অনুষ্ঠিত হত। সেখানে কবিগণ তাঁদের কবিতা আবৃত্তি করতেন, কবি আহমাদ মুহার্‌রামও তাঁর কবিতা আবৃত্তি করতেন। এই কবিতাগুলি তিনি স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠাতেন। কিন্তু ইহা তাঁকে স্বাভাবিক জীবনের নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। তিনি তাঁর পিতার সমৃদ্ধ লাইব্রেরীতে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করতেন। তিনি ছিলেন পড়াশুনায় সর্বদা নিমগ্ন। মাঝে মাঝে রাত্রে বাতির তেল শেষ হয়ে যেত এবং তিনি কবিতা ও কবিতার বই নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর যথোচিত কদর হয়নি বলে তিনি তাঁর কবিতায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন।[২২]

তিনি দামানহুরে অবস্থিত সামান্য একটি বাড়ির মালিক ছিলেন। পিতার ইন্তেকালের পর লেখালেখির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ দিয়ে তিনি উক্ত বাড়িতে বসবাস করতেন। শেষ জীবনে দামানহুরে অবস্থিত লাইব্রেরীর পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[২৩] তিনি মিশরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা মুস্তফা কামিল পাশার প্রজন্মের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। ফলে তাঁর মধ্যে বীরত্ব ও দেশাত্মবোধক চেতনা জেগে ওঠে। তিনি ইসলামী সংগঠন ও প্রাচ্য ঐক্যের আহ্বান জানান।[২৪] এভাবে ইসলামী চেতনার সাথে সাথে জাতীয়তাবাদী চেতনায় সিক্ত ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান ও সৃষ্ট কাব্য সম্ভার।

তাঁর স্বভাব-প্রকৃতি

তিনি হালকা-পাতলা দেহ বিশিষ্ট ও প্রখর মেধার অধিকারী ছিলেন। যখন কথা বলতেন নীচু স্বরে ফিসফিস করে ইশারা ইঙ্গিতে বলতেন।[২৫] তিনি হাত ও জবানের ব্যবহারে ছিলেন সংযমী।[২৬] নিরবতা পছন্দ করতেন এবং নি:সঙ্গতা ভালবাসতেন। তিনি অধিক চিন্তাশীল ছিলেন।[২৭] দেশের জন্য তিনি ছিলেন একজন সৎ ও নিবেদিত প্রাণ। তিনি মজবুত ঈমানের অধিকারী ছিলেন, জীবনের বিভিন্ন সমস্যায় ছিলেন কঠোর সহিষ্ণ ও ধৈর্যশীল।[২৮] সভা-সমাবেশ অংশগ্রহণ করলে শোরগোল হতে অনেক দূরে এক পার্শ্বে অবস্থান করতেন। যাতে তিনি তাঁর সঠিক মতামত উপস্থাপন করতে পারেন। দামানহুর শহরে এক মাঠে নির্ধারিত একটি গাছের নীচে বিশ্রাম নিতেন, সে গাছটি শাজারাতু মুহাররাম নামে পরিচিত ছিল।[২৯] তিনি কাব্যঙ্গনে এক বিশেষ স্থান দখল করার পাশাপাশি তীব্র আবেগ শিল্প-সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে সুস্থ্য রুচিবোধ, সুদৃঢ় ঈমান, গভীর

দার্শনিক অনুভূমি এবং সুদীর্ঘ জীবনে জাতীয়তাবাদী চেতনা দ্বারা বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ছিলেন।[৩০] তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে যৎকিঞ্চিত খুঁতও পরিলক্ষিত হয় যেমন তিনি কায়রোর ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ জীবনের উপর গ্রাম্য নিঃসঙ্গতাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর সুউচ্চ নীতিমালার ব্যাপারে মানুষের মাঝে মতানৈক্য আছে। তাঁর মাঝে চারিত্রিক নিস্কলুষতা ও সুদৃঢ় পারলৌকিক বিশ্বাস বিদ্যমান ছিল। তিনি কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির চাটুকারিতা করেননি। সত্য প্রকাশে নমনীয়তা কিংবা প্রতারণায় তিনি অজ্ঞ ছিলেন।[৩১] এভাবে আমরা তাঁর মধ্যে সৎ ও উল্লেখযোগ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সমাহার দেখতে পায়।

মৃত্যু

এই আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মিশরীয় মুসলিম কবি, সুদীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনের অবসান ঘটিয়ে ১৩৬৫ হিঃ[৩১]/১৯৪৫[৩৩] সালে নিজ বাসস্থান দামানহুর শহরেই ইন্তকাল করেন। মৃত্যু অবধি তাঁর জীবন মুসলিম উম্মার খেদমতে এই শহরেই অতিবাহিত হয়।[৩৪] জন্ম তারিখ ২০ জানুয়ারী ১৮৭৭ অনুযায়ী মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বৎসরে কিছু কম। তাঁর মৃত্যুতে মিশরবাসী তথা সমগ্র বিশ্বের সাহিত্যমোদী মানুষ শোকাহত হয়।

অবদান

সাহিত্য হল মানব জীবনের মানসিক খোরাক ও সমাজ জীবনের দর্পন। তাই কোন ভাষার সাহিত্য হলো সেই ভাষার কবি ও সাহিত্যিকদের এমনসব অনুপম বচনমালা যাতে রয়েছে সুক্ষ্ম চিন্তার কল্পনা ও সুন্দর ভাবনার চিত্রায়ন এবং যে বচনমালা আত্মাকে করে পরিশুদ্ধ, রসনাকে করে সংস্কৃতিবান আর শাণিত করে অনুভূতিকে-[৩৫] এ কথার বিচারে কবি আহমাদ মুহাররাম ও তাঁর সকল সাহিত্যকর্ম যে গুণে-মানে পরিপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। আরবী সাহিত্যাকাশে এই মহান কবির অবদান অপরিসীম। তিনি এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে সাহিত্যাঙ্গণে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব এবং আধুনিক আরবী কাব্য সাহিত্যের বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি তাঁর উচ্চ শৈল্পীক সাহিত্যকর্মের অবদান দ্বারা সাহিত্যকে দীর্ঘায়িত করেছেন। তাঁর কাব্যসম্ভার পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে, মানুষকে ব্যস্ত করে রেখেছে, দেশের দিক-দিগন্তে তাঁর সুনামখ্যাতি সিদ্ধি লাভ করেছে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, তিনি স্বভাবজাত কবি এবং আল্লাহ প্রদত্ত প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। অবশ্য তাঁর ছোট বেলা হতেই এর নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে এবং এই প্রতিভা নিয়েই তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন।[৩৬]

তিনি আমাদের জন্য এক বিশাল সহিত্য ভান্ডার রেখে যান। যার অধিকাংশই কবিতা। তাঁর অল্প সংখ্যক গদ্য সাহিত্যও রয়েছে।[৩৭] তাঁর সাহিত্যিক জীবন যোগ্যতা, শক্তি ও আভিজাত্যে পরিপূর্ণ। এ সকল গুণের সমন্বয়ে তিনি বহু কাব্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ফলে ১৯১০ সালে বিচারকরদের রায়ে

নীলদের কবিদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের সনদ লাভ করেন। আরবী সাহিত্যের গদ্য-পদ্য উভয় বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ১৫টি পুরষ্কার লাভ করেন যা বিভিন্ন সাময়িকী ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।[৩৮] নিম্নে তাঁর সাহিত্যিক অবদানের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল:

আহমাদ মুহাররাম তাঁর সাহিত্যকর্ম বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশ করতেন। তন্মধ্যে 'ওবুল্ল' ও 'ফাতাহ' নামক পত্রিকা উল্লেযোগ্য। তবে পত্রিকায় প্রকাশিত ছাড়াও তাঁর সাহিত্যের এক বিরাট অংশ রয়েছে। 'আল ইলইয়াজা আল ইসলামীয়া' তাঁর রেখে যাওয়া সাহিত্য কর্মের মধ্যে সর্ববৃহৎ সাহিত্য গ্রন্থ। তাঁর মৃত্যুর পর এ'টি দু'বার প্রকাশিত হয়েছে। কবি তাঁর এই দিওয়ানকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। এই গ্রন্থে কবি ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনাবলী, হিজরত, গাযওয়া, সারিয়্যা ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া ইসলামের শুভ উদয়ের গৌরবময় ইতিহাস বিশেষত রাসূল (সা.) এর জীবনী ও সাহাবায়ে কিরামের জীবন চরিত্র উপস্থাপন করেছেন।

''দিওয়ানু মুহাররাম'' নামে তাঁর অপর একটি কাব্য গ্রন্থ রয়েছে। যার প্রথমখন্ড তাঁর জীবদ্দশাতেই ছাপা হয় এবং সমগ্র অংশ সেই সময়ই ছাপার উদ্যোগ নেয়া হয়। এটি ছয় খন্ডে বিভক্ত একটি বৃহৎ দিওয়ান। ইসলামী বিষয়ে প্রাধান্য প্রাপ্ত কবিতা ছাড়াও সকল বিষয়ক কবিতাই এতে স্থান পেয়েছে।

'নাকবাতুল বারামিকাহ্' নামে তাঁর একটি কাব্যনাট্যও আছে। তাঁর অসংখ্যা প্রবন্ধ, সাহিত্য বিষয়ক রচনাবলী এবং গবেষণাধর্মী নিবন্ধ মিশরের পত্র পত্রিকায় ও ম্যাগাজিনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সেগুলোকে আর সংকলন করা হয়নি।[৩৯]

পরিশেষে আমি বলতে পারি যে, আহমাদ মুহাররাম ছিলেন আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন তুর্কীবংশোদ্ভূত মিশরীয় সন্তান। তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত ছিল তুর্কীরক্ত। সত্যনিষ্ঠ দেশ প্রেমের চেতনায় উজ্জীবিত ছিল তাঁর চেতনা। তীব্র ইসলামী চেতনার বর্হি:প্রকাশ ঘটিয়ে সৃষ্টি করেছেন এক অমর কীর্তি ''দিয়ানু মাজদিল ইসলাম'' যা কালের শাসন অতিক্রম করে অনন্তকাল আরবী কাব্য সাহিত্যাঙ্গনে টিকে থাকবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ইসলাম ও আরব জাতীয়তাবাদের চেতনায় সিক্ত ছিল তাঁর লেখনী। তাইতো তাকে شاعر العروبة والإسلام (আরবত্ব ও ইসলাম)'র কবি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।[৪০]

তথ্যসূত্র

১। খায়রুদ্দীন আয-যিরকলী, *আল-আ'লাম*, (লেবানন, বৈরুত: দার আল-ইল্‌ম লিল মালায়ীন, ১৯৮৬), ৭ম সংস্করণ, প্রথম খন্ড, পৃ. ২০২।

২। আহমাদ কাব্বিশ, *তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীছ*, (লেবানন, বৈরুত: দার আল-জীল, ১৯৭১) পৃ. ৯৮।

৩। খায়রুদ্দীন আয-যিরকলী, *আল-আ'লাম*, পৃ. ২০২; আহমাদ আব্দুল লতীফ আল-জাদা ওয়া হুসনী আদ্‌হাম জারার, *শু'আরা আল-দা'ওয়াহ আল-ইসলামিয়্যা ফি আল-আসর আল-হাদীছ*, (লেবানন, বৈরুত: মুআচ্ছাছাতু আল-রিসালা, ১৯৭১), পৃ. ৬৪।

৪। আহমাদ কাব্বিশ, *তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীছ*, পৃ. ৯৮।

৫। মুহাম্মদ ইবন সা'দ ইবন হুসাইন, *আল-আদব আল-হাদীছ তারীখ ওয়া দিরাসাত*, (রিয়াদ: দার আব্দুল আযীয আল হুসাইন, ১৯৯৭ইং), সপ্তম সংস্করণ, ১ম খন্ড, পৃ. ২০০; মুহাম্মদ ইবন সা'দ ইবনে হুসাইন, *আল-আদব আল-আরবী ওয়া তারীখুহু* (আল-আছর আল-হাদীছ), (আল-মামলাকাহ্ আল আরাবিয়্যাহ্ আল-সৌদিয়্যাহ্, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৪১২ হি.), ৫ম সংস্করণ, পৃ. ৬২

৬। http://ar.wikipedia.org/wiki

৭। খায়রুদ্দীন আয-যিরকলী, *আল-আ'লাম*, পৃ-২০২,

৮। আহমাদ আব্দুল লতীফ আল-জাদা ওয়া হুসনী আদ্‌হাম জারার, *শু'আরা আল-দা'ওয়াহ আল-ইসলামিয়্যা ফি আল-আসর আল-হাদীছ*, পৃ. ৬৪

৯। মুহাম্মদ ইবন সা'দ ইবন হুসাইন, *আল-আদব আলী-আরবী ওয়া তারীখুহু*, পৃ. ৬২

১০। আহমাদ আব্দুল লতীফ আল-জাদা ওয়া হুসনী আদ্‌হাম জারার, *শু'আরা আল-দা'ওয়াহ আল-ইসলামিয়্যা ফি আল-আসর আল-হাদীছ*, পৃ. ৬২

১১। মুহাম্মদ ইবনে সা'দ ইবন হুসাইন, *আল-আদব আলী-আরবী ওয়া তারীখুহু*, পৃ. ৬২

১২। মুহাম্মদ ইবনে সা'দ ইবন, *আল-আদব আল-হাদীছ তারীখ ওয়া দিরাসাত*, পৃ. ২০০

১৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

১৪। আহমাদ আব্দুল লতীফ আল-জাদা ওয়া হুসনী আদ্‌হাম জারার, *শু'আরা আল-দা'ওয়াহ আল-ইসলামিয়্যা ফি আল-আসর আল-হাদীছ*, পৃ. ৬৪-৬৫।

১৫। প্রাগুপ্ত, পৃ. ৬৫

১৬। প্রাগুপ্ত, পৃ. ৬৫

১৭। মুহাম্মদ ইবনে সাৎদ ইবন হুসাইন, *আল-আদব আল-আরবী ওয়া তারীখুহু*, ১৪১২ হিঃ, পৃ. ৬২

১৮। আহমাদ আব্দুল লতীফ আল-জাদা ওয়া হুসনী আদ্‌হাম জারার, *শু'আরা আল-দা'ওয়াহ আল-ইসলামিয়্যা ফি আল-আসর আল-হাদীছ*, পৃ. ৬৫-৬৬।

১৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

২০। মুহাম্মদ ইবনে সাৎদ ইবন হুসাইন, *আল-আদব আল-আরবী ওয়া তারীখুহু*, পৃ. ৬২

২১। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

২২। মুহাম্মদ ইবন সা'দ ইবনে হুসাইন, *আল-আদব আল-হাদীছ, তারীখ ওয়া দিরাসাত*, পৃ. ২০০

২৩। আহমাদ কাব্বিশ, *তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীছ*, পৃ. ৯৮

২৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

২৫। মুহাম্মদ ইবনে সা'দ ইবন হুসাইন, *আল-আদব আল-আরবী ওয়া তারীখুহু*, পৃ. ৬৩

২৬। আহমাদ কাব্বিশ, *তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীছ*, পৃ. ৯৮

২৭। মুহাম্মদ ইবন সা'দ ইবন হুসাইন, *আল-আদব আল-হাদীছ তারীখ ওয়া দিরাসাত*, পৃ. ২০১

২৮। আহমাদ আব্দুল লতীফ আল-জাদা ওয়া হুসনী আদ্‌হাম জারার, *শু'আরা আল-দা'ওয়াহ আল-ইসলামিয়্যা ফি আল-আসর আল-হাদীছ*, পৃ. ৬৫।

২৯। মুহাম্মদ ইবন সা'দ ইবন হুসাইন, *আল-আদব আল-হাদীছ তারীখ ওয়া দিরাসাত*, পৃ. ২০১

৩০। আহমাদ মুহাররাম, *দিওয়ানু মাজদিল ইসলাম*, (কুয়েত: মাকতাবাতুল ফালাহ্, ১৯৮২ইং), ১ম সংস্করণ, পৃ. ২৯।

৩১। প্রাগুক্ত, পৃ-২৫।

৩২। মুহাম্মদ ইবনে সা'দ ইবন হুসাইন, *আল-আদব আল-হাদীছ তারীখ ওয়া দিরাসাত*, পৃ. ২০১

৩৩। আহমাদ আব্দুল লতীফ আল-জাদা ওয়া হুসনী আদ্হাম জারার, *শু'আরা আল-দা'ওয়াহ আল-ইসলামিয়্যা ফি আল-আসর আল-হাদীছ*, পৃ. ৬৬।

৩৪। মুহাম্মদ ইবনে সা'দ ইবন হুসাইন, *আল-আদব আল-হাদীছ তারীখ ওয়া দিরাসাত*, পৃ. ২০১

৩৫। আহমাদ হাসান যায়্যাত, *তারীখ আল-আদাব আল-আরবী*, (লেবানন, বৈরুত: দার আল-মা'আরিফাহ, ১৯৯১ইং), ৫ম সংস্করণ, পৃ. ৭

৩৬। আহমাদ আব্দুল লতীফ আল-জাদা ওয়া হুসনী আদ্হাম জারার, *শু'আরা আল-দা'ওয়াহ আল-ইসলামিয়্যা ফি আল-আসর আল-হাদীছ*, পৃ. ৬৬।

৩৭। মুহাম্মদ ইবন সা'দ ইবন হুসাইন, *আল-আদব আল-হাদীছ তারীখ ওয়া দিরাসাত*, পৃ. ২০২

৩৮। প্রাগুক্ত, পৃ-২০২; আহমাদ কাব্বিশ, *তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীছ*, পৃ. ৯৮

৩৯। মুহাম্মদ ইবন সা'দ ইবন হুসাইন, *আল-আদব আল-আরবী ওয়া তারীখুহু* (আল-আছর আল-হাদীছ), পৃ. ৬৩

৪০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

আহমাদ মুহাররামের কবিতার বিষয়বস্তু ও ইসলামী চেতনার নানাদিক

প্রথম পরিচ্ছেদ : আহমাদ মুহাররামের কবিতার বিষয়বস্তু

- ভূমিকা
- ইসলামী কবিতা
- সামাজিক কবিতা
- দেশাত্মবোধক কবিতা
- রাজনৈতিক কবিতা
- বর্ণনামূলক কবিতা
- শোকগাঁথা কবিতা
- নাট্য কবিতা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ আহমাদ মুহাররামের কবিতায় ইসলামী চেতনার নানাদিক

- ভূমিকা
- মুহাম্মদ (সা.) এর আগমন ও ইসলামী দাওয়াত
- মহানবীর (সা.) হেরাগুহায় অবস্থান ও ওহী আগমন
- দ্বীনের কেন্দ্র দারুল আরকাম ও ওমর (রা.) এর ইসলাম গ্রহণ
- রাসুল (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র ও মদিনায় হিজরত
- আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ (সা.)
- ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ
- মক্কা বিজয়
- ইসলাম ধর্মের কটুক্তিকারী লর্ড ক্রোমারের বক্তব্যের জবাব
- ইসলামের উপর অটল থাকার আহবান
- মুসলিম ঐক্যের প্রতীক তুর্কি খেলাফতের প্রশংসা
- ইসলামী সভ্যতা
- উপসংহার

প্রথম পরিচ্ছেদ : আহমাদ মুহাররামের কবিতার বিষয়বস্তু

ভূমিকা

আহমাদ মুহাররাম তাঁর যুগে প্রচলিত বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন। যেমন প্রশংসামূলক, ব্যঙ্গাত্মক, বর্ণনামূলক, প্রেম, কাব্যনাট্য, অভিযোগমূলক, গবেষণাধর্মী ও গীতি কবিতা। এ প্রসঙ্গে ড. মুহাম্মদ ইবনে সাদ ইবনে হুসাইন বলেন-১/৪

لقد طرق شاعرنا جميع الأغراض الشائعة في عصره فمدح وهجا ووصف وتغزل وعالج الشعر المسرحي وشكا وتأمل وتغني.

তবে তাঁর সমগ্র কাব্যসাধনাকে পর্যালোচনা করলে বিষয়বস্তু অনুসারে আমরা তা নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করতে পারি।

الشعر الإسلامي	ইসলামী কবিতা
الشعر الإجتماعي	সামাজিক কবিতা
الشعر الوطني	দেশাত্মবোধক কবিতা
الشعر السياسي	রাজনৈতিক কবিতা
الشعر التاريخي	ঐতিহাসিক কবিতা
الشعر الوصفي	বর্ণনামূলক কবিতা
الشعر المراثي	শোকগাঁথা কবিতা
الشعر المسرحي	নাট্য কবিতা[২]

নিম্নে প্রত্যেক প্রকার কবিতা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

ইসলামী কবিতা

ইসলামী বিষয় কবিতা রচনা করতে তিনি সবচেয়ে বেশী আগ্রহী ছিলেন। তিনি দুটি বিষয়ে সর্বাধিক পরিমাণে অনুপম ও চমৎকার ভঙ্গিতে কবিতা রচনা করেছেন। বিষয় দুটি হলো- ইসলামী কবিতা ও সামাজিক কবিতা। এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সমসাময়িক কবিদেরকে ছাড়িয়ে গেছেন। ইসলামী কবিতা মূলত ঐ সকল কবিতাকে বলে যাতে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিবিধান করা হয়েছে।[৩] আহমাদ মুহাররামের ইসলামী কবিতাও এর ব্যতিক্রম ন। তিনি ইসলাম ও মুসলিম জাতির উপর আঘাত দানকারী ঐ সকল শত্রুর মোতাবিলায় কবিতা রচনা করেছেন, যারা:

১. মুহাম্মদ (সা.) কে বিকৃত রূপে উপস্থাপন করেছেন;

২. আল-কুরআন ও পবিত্র সুন্নাহ কে দোষারোপ করে কথা বলেছে।

এক্ষেত্রে বৃটিশ উপনিবেশিক শাসক লর্ড ক্রোমারের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।[৪] তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য বরে বলেন-[৫]

إن سبب تأخرهم وتخلفهم وانحطاطهم هو اعتناقهم الإسلامية لأنه (أي الإسلام) كما يزعم، دين جهل وخرافة وتواكل.

'মুসলমানদের ব্যর্থতা এবং অধ:পতনের কারণ হলো ধর্ম হিসেবে ইসলামকে অনুসরণ করা। কেননা তার ধারণামতে ইসলাম অজ্ঞাত ও কাল্পনিক ধর্ম।'

মুসরিম কবি সাহিত্যিকরা সাথে সাথে তার প্রতি উত্তর করেন। তবে এক্ষেত্রে আহমাদ মুহাররামের স্বর ছিলো অত্যন্ত তীব্র ও তীক্ষ্ম। তিনি এই খৃষ্টান শয়তানের বক্তব্যের অসারতা কে তুলে ধরে এক দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। তাতে তিনি বলেন, মুসলমানদের পতনের মূল কারণ ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়া ঠিকই তবে, এক্ষেত্রে ত্রুটি মুসলমানদের মধ্যে, ইসলামের মধ্যে নয়। তিনি বলেন-[৬]

زعمت بنا مزاعم كاذبات — وما يغني مقال الزاعمينا

زعمت الدين والقرآن جاءا — بما يشقي حياة المسلمينا

زعمت محمدا لم يؤت رشدا — ولم يسلك سبيل الصالحينا

رويدك أيها الجبار فينا فبئس — الحكم حكم القاسطينا

তুমি (লর্ড ক্রোমার) আমাদের ব্যাপারে মিথ্যা ধারণা করেছ। ধারণাকারীর বক্তব্য কোন কাজে আসবে না। তুমি মনে করেছ দ্বীন ইসলাম এবং আল-কুরআন মুসলমানদের জীবনে দুঃখ দুর্দশা বয়ে নিয়ে এসেছে। তুমি ধারণা করেছ যে, মুহাম্মদ (সা.) হেদায়েত নিয়ে আগমন করেননি এবং তিনি নিজেও সৎকর্মশীলদের পথ অনুসরণ করেননি। আমাদের মাঝে বিদ্যমান হে অহংকারী শাসক তুমি ধীরে চল। অন্যায়কারীর বিচার কতই না নিকৃষ্ট।

সামাজিক কবিতা

আহমাদ মুহাররাম এমন এক সমাজে বাস করতেন, যে সমাজ বিভিন্ন প্রকার সামাজিক ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিল। পাশ্চাত্য স্বভাব ও রীতি-নীতির প্রতি মুসলমানদের ঝুঁকে পড়াই ছিল এর মূল কারণ। তাছাড়া তৎকালীন মিশরীয়দের আচার-আচরণ, অনুকরণ-অনুসরণ ও সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলা ইসলামী দর্শনের অনুগামী ছিলো না। আহমাদ মুহাররাম তাঁর সমাজকে গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি সামাজিক নিয়ম-

শৃঙ্খলা, শিষ্টাচার ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে বক্রাতামুক্ত পন্থায় ও বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতিতে জীবন অতিবাহিত করেছেন। ঐ সকল দৃশ্য অবলোকন করে অবশেষে কবিতার মাধ্যমে তা সমাধান করার প্রয়াস চালিয়েছেন। তিনি মন্দকে মন্দ বলে চিহ্নিত করেন এবং তা থেকে সকলকে বিরত থাকতে বলেন। পক্ষান্তরে ভালকে ভাল বলেন এবং তা আঁকড়ে ধরার আহবান জানান। তিনি আত্মহত্যাকে একটি সামাজিক ব্যাধি হিসেবে সাব্যস্ত করে তা ঘৃনা করেন।[৭]

তিনি তাঁর সামাজিক কবিতায় এমন অসংখ্য ব্যাধির বর্ণনা দিয়েছেন, যে ব্যাধিসমূহ মুসলিম জাতিকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দিচ্ছে এবং তাদেরকে সভ্যতার পথে ধাবিত হতে বাধাগ্রস্থ করছে। তিনি জাতির ভবিষ্যৎ যুব সমাজের প্রতি মনোনিবেশ করে প্রত্যাশিত চরিত্রগঠন ও চরিত্রভিত্তিক জ্ঞান অর্জনের প্রতি জোর তাগিদ দিয়েছেন। কেননা জাতির উন্নতি ও অগ্রগতি তার উপরেই নির্ভর করে। শিক্ষাদান ও নৈতিকতা সম্বলিত তাঁর একটি কবিতা হলো (যুবকের শিষ্টাচার)। যেমন কবি বলেন-[৮]

يا أيها الناشي الغادي بدفتره   للعلم يمشي ولكن لا على سنن

من أنفق العمر في علم بلا أدب   فليشتر الجهل بالغالى من الثمن

العلم تنصر بالأخلاق دولته   فاقهر بها دولة الأهواء والفتن

لا يصلح المرأ ان ساءت خلائقه   فاعمد إلى كل خلق صالح حسن

لم يشرع الله دينا في خلقته   إلا على صالح الآداب والسنن

'যে তরুণ জ্ঞান অন্বেষণে তার উপকরণ নিয়ে ছুটছে অথচ সে সঠিক নীতির উপরে নেই (তাহলে সে কল্যাণকর জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না।) যে ব্যক্তি শিষ্টাচার ব্যতিত শুধু জ্ঞান অর্জনেই জীবন অতিবাহিত করেছে সে কেবল চড়া মূল্যে মূর্খতা-ই ক্রয় করেছে। তুমি চরিত্র দ্বারা জ্ঞানের রাজ্যে পৃষ্ঠপোষকতা করবে এবং তা দ্বারা প্রবৃত্তি ও গোলাযোগের প্রভাবকে বশীভূত করবে। যার স্বভাব-প্রকৃতি খারাপ সে কখনো সৎকর্মশীল হবে না। ফলে তুমি সৎ, যোগ্য ও উত্তম সৃষ্টির প্রতিই মনোযোগী হও। আল্লাহ তা'তায়ালা দুনিয়াকে (দুনিয়ার বিধিবিধানকে) কেবল শিষ্টাচার ও নিয়ম-নীতি গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তির উপরেই প্রবর্তন করেছেন।'

দেশাত্মবোধক কবিতা

মিশরে কর্নেল উরাবীর বিদ্রাহে-আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর থেকে আরববিশ্ব কঠিন অবস্থা ও সংকটের মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে। সেখানে শুরু হয় বৃহৎ শক্তিবর্গের ক্ষমতা লাভের প্রতিযোগিতা। মিশরে আধিপত্যবাদী শক্তিগুলোর সাথে দীর্ঘ দিন ধরে চরম দ্বন্দ্ব ও কলহ চলতে থাকে। দেশাত্ববোধে উজ্জীবিত

জনতা ও দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দ তাদের মুকাবিলা করতে থাকে দৃঢ় পদে। এ ছাড়া ফিলিস্তিন, সিরিয়া, লেবানন, হিজায, ইরাক ও আলজেরিয়া প্রভৃতি দেশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সাথেও আরব জাতিসমূহের তুমুল যুদ্ধ বাঁধে। আরবীকাব্য ঐ যুদ্ধের বহ্নিশিখা প্রজ্জ্বলনে এগিয়ে আসে, বীর কেশরী সৈনিকদের মাঝে নবউদ্যম ও প্রেরণা যোগায়, জনগণের মাঝে স্বাধীনতা ও মুক্তির চেতনা সৃষ্টি করে এবং দখলদার বাহিনীর প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রতিষ্ঠা করে। মোট কথা দীর্ঘ দিনের অত্যাচারে ক্লিষ্ট প্রতিটি আরব মুসলমানের অন্তরে জাতীয়চেতনা ও দেশাত্মবোধ উদগ্র হয়ে ওঠে। কবিগণও কবিতার সাহায্যে খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে উপনিবেশবাদী শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে। তখনকার আরববিশ্বে এমন কোন কবি দেখা যায়নি, যার অন্তরে তাদের বিরুদ্ধে আলোড়ন সৃষ্টি হয়নি এবং এ প্রসঙ্গে দু-একটি কবিতা রচনা করেনি।[৯] এক্ষেত্রে মিশরের কবি আহমাদ মুহাররাম ব্যতিক্রম নন। তিনি ছিলেন দেশপ্রমের চেতনায় উজ্জীবিত এবং স্বদেশের প্রতি তীব্র অনুরাগী। যেমন ওমর দাসুকী বলেন-[১০]

أجل! كان محرم وطنيا شديد الغيرة على وطنه، متعصبا في الحق

'হ্যাঁ! আহমাদ মুহাররাম ছিলেন জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিত্ব, দেশের প্রতি তীব্র অনুরাগী এবং সত্য প্রকাশে অনমনীয়।'

দেশের প্রতি তীব্র ভালবাসা থেকে তিনি বলেন:[১১]

ليس التعصب للرجال معرة إن الكريم لقومه يتعصب

'পুরুষের জন্য পক্ষপাতিত্ব কোন অপমান কর বিষয় নয়। নিশ্চয় সম্মানিত ব্যক্তিরা তাদের জাতির জন্য পক্ষপাতিত্ব করে থাকেন।'

তিনি ঐ সকল দেশাত্মবোধ সম্পন্ন কবিদের অগ্রনায়ক ছিলেন যারা স্বীয় মাতৃভূমির ভালবাসায় অনড় অবিচল ছিল। যারা দেশের প্রতিরক্ষা বিধানে ছিল অনমনীয়। তিনি কাসীদাতে রাষ্ট্র পতনের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের দিকে আহবান করেছেন। যেমন তিনি বলেন-[১২]

سلني بأدواء الشعوب فإنني طب بأدواء الشعوب مجرب

إن الشعوب إذا استمر جثومها جثم الردى من حولها يترقب

ليس الشقاء بزائل عن أمة حتى يزول تفرق وتجزب

'জাতির ব্যাধি সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা কর, নিশ্চয় আমি ে সব্যাপারে অভিজ্ঞ ডাক্তার। যদি জাতি উপুড় হয়ে চলতে থাকে তাহলে চতুর্দিক থেকে প্রত্যাশিত ধ্বংস ধেয়ে আসবে। কোন জাতি গোষ্ঠি থেকে দু:খ দুর্দশা ততক্ষণ পর্যন্ত দূরীভূত হবে না যতক্ষন না উক্ত জাতির থেকে ভেদাভেদ, বিচ্ছিন্নতা ও দলীয়করণ দুর হয়।'

রাজনৈতিক কবিতা

আহমাদ মুহাররাম ছিলেন রাজনৈতিক কবিও। তিনি সামাজিক ও ইসলামী বিষয়ের পাশাপাশি রাজনৈতিক কবিতাও লিখতেন। তাঁর ব্যাপারে বলা হয়।[১৩]

كان شاعرا صاحب رسالة، كان شاعر مصر سياسيا واجتماعيا وكان شاعر العروبة **والإسلام.**

'আহমাদ মুহাররাম রিসালাতের কবি, তিনি মিশরের রাজনৈতিক ও সামাজিক কবি, তিনি আরবত্ব ও ইসলামী কবি।

يا قوم تلك شعرية ماسنها **من قبل ذباح ولا جلاد**

(بلفور) أنزلها وباء بإثمها **والظلم إثم كله وفساد**

هلا تبين وهو يقضي أمره **أبياع شعب، أم يباع جماد**

'হে আরব জাতি ঐ সকল নীতিমালা তো (ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কল্পে) ইতিপূর্বে সকাই এবং জল্লাদরাই প্রণয়ন করেছে। (বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী লর্ড বেলফোর ১৯১৭ সালে ২ নভেম্বর) ঐ সকল নীতিমালা ঘোষণা করেন যার অনিষ্টতায় (অত্র এলাকায়) মহামারী সৃষ্টি হয়েছে। (মনে রাখবে) জুলুমের সবটাই অপরাধ ও বিশৃংখলার নামান্তর। সে কি (ইতিপূর্বে জনমত) যাচাই করেনি? অথচ সে নিজের মতামত বাস্তবায়ন করছে। কেটা জাতিকে বিক্রয় করা হচ্ছে না কি পদার্থকে?'

বর্ণনামূলক কবিতা

বর্ণনামূলক কবিতা আরবী কাব্যসাহিত্যের গতানুগতিক বিষয় সমূহের একটি। প্রাচীনকাল থেকে অদ্যবধি অধিকাংশ কবিই এ বিষয়ে দু চারটি ছত্র রচনা করেছেন। তথাপি একে আরবী কাব্য সাহিত্যে আধুনিক বিষয়বস্তু হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ আধুনিক কালেই প্রকৃত বর্ণনামূলক কবিতা রচিত হয়েছে।[১৫] আমাদের কবি আহমাদ মুহাররামের সমগ্র কবিতা তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে পরখ করলে তাতেও কিছু বর্ণনা মূলক কবিতা দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন القرآن الكريم শিরোনামের কবিতাটি এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করা যায়। কবিতাটির অংশ বিশেষ নিম্নরূপ-[১৬]

يا قومنا، هل تعرفون كتابكم؟ **أم ليس فيكم مؤمن يتذكر**

عذرا، فقد عظم البلاء فهاجنى حتى لا حسب مهجتى تتفجر

وكأن في كبدي وبين جوانحى نارا مؤججة تجيش وتهدر

إن تجهلوه فإنه السر الذي يحيى لنفوس إذا تموت وتقبر

وهو الحمى المأمول يعصمنا إذا **جرت الأمور بما نخاف ونحذر**

ماذا نخاف؟ وكل حرف معقل ولمن ندير؟ وكل سطر عسكر

هو قوة الإسلام، ما من قوة ترمى بها إلا ترد وتقهر

'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কি তোমাদের ধর্মগ্রন্থকে চেন? না কি তোমাদের মাঝে কোন মুমিন নেই, যে উপদেশ গ্রহণ করবে? ঠিক আছে! বিপদাপদ কঠিনরূপ ধারণ করেছে, অত:পর তা আমাকে উত্তেজিত করেছে; অনন্তর আমার মনে হচ্ছে আমার অন্তর ফেটে পড়ার উপক্রম। এবং যেন আমার পাঁজড় মধ্যস্থ অন্তরের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। যদি তোমরা কুরআনের ব্যাপারে অজ্ঞ হও তাহলেজেনে রাখ তা (কুরআন) হলো এমন একটিা তাৎপর্যপূর্ণ বস্তু যা আত্মাকে জীবিত করে যখন তা মরে যায় এবং কবরস্থ করা হয়। কুরআন হলো উত্তম আশ্রয় স্থল, যা আমাদেরকে রক্ষা করে, যখন এমন বিষয়বস্তু (আমাদের উপর দিয়ে) অতিক্রান্ত করে যার কারণে আমরা ভীত ও আতঙ্কগ্রস্থ হই। আমরা কোন জিনিসকে ভয় করব? (কুরআনের) প্রত্যেকটি বর্ণই আশ্রয়স্থল এবং আমরা কার অনুগত হব? তাঁর প্রতিটি লাইন যেন সৈন্য সাদৃশ্য। কুরআন ইসলামের শক্তি। সকল শক্তি কুরআনের মুকাবিলায় প্রত্যাখ্যাত ও বশীভূত।'

তিনি কুরআনের গুণাগুন বর্ণনায় আরো বলেন:

هذا كتاب للحياة مفصل **وضحت به الآيات والأحكام**

مضت الدهور، وما يزال كأنه بمكانه، ما فص عنه ختام

'এটি জীবনের বিষদ বিবরণ সম্বলিত গ্রন্থ। এর দ্বারা মোযেযা ও বিধানসমূহ স্পষ্ট হয়েছে। অনেকগুলো যুগ অতিবাহিত হওয়ার পরও এটি (কুরআন) কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ছাড়াই স্বস্থানে বিদ্যামান। এর থেকে পরিসমাপ্তিকে ছিন্ন করা হয়নি।'

শোকগাঁথা কবিতা

রিছা বা শোকগাঁথা আরবী কবিতার একটি প্রাচীনতম বিষয়। আরবী সাহিত্যের সকল যুগেই এ বিষয় কবিতা রচিত হয়েছে। আর শোকগাঁথা হলো:[১৭]

المدح هو ابراز فضائل الممدوح حيا، الرثاء هو المدح بعينه لكنه ابراز فضائل المراثي ميتا.

‘স্তুতি কবিতায় জীবিত প্রশংসিত ব্যক্তির গুণাবলীর বর্ণনা করা হয়। আর শোকগাঁথা বা মর্সিয়া কবিতায় মৃত প্রশংসিত ব্যক্তির গুণাবলীর বর্ণনা করা হয়ে থাকে।’

কবি আহমাদ মুহাররাম আন্তরিক অনুভূতি ও অভিব্যক্তি প্রকাশের মাধ্যমে বেশ কয়েকজন গুণী ব্যক্তির মৃত্যুতে শোক কবিতা রচনা করেছেন। তিনি মিশরীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ মুহাম্মদ ফরীদ[১৮]-এর মৃত্যুতে শোক কবিতা রচনা করেছেন। তার কয়েকটি চরণ নিম্নরূপ-[১৯]

مضت الحضارة في جلال حماتها ومضوا بأبهة الزمان الأقدم.

‘(সভ্যতা সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মুহাম্মদ ফরীদ। তাঁর ইন্তেকালে যেন সভ্যতাও বিলীন হয়ে গেছে। তাই কবি বলেন) সভ্যতার পৃষ্ঠপোষকদের সম্মানে সভ্যতাও চলে গেছে। তারা অতীতকালে জাঁকজমকের সাথেি অতিবাহিত হয়েছে। রাষ্টসমূহে তারাই ছিলেন সভ্যতা উন্নতকারী এবং এক্ষেত্রে তারা সুউচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হয়েছিলেন। (ইসলামী) সভ্যতা-সংস্কৃতি অবনতিতে তারা আল্লাহকে ভয় করতেন। তারা লাঞ্ছিত মুসলমানের আশ্রয়স্থল ও রক্ষাকারী ছিলেন। তারা ছিলেন সভ্যতার আধিবাসীদের কে হেদায়তের উপর একত্রকারী আর অন্ধযুগের তমাশাকে বিদীর্ণকারী। তারা ছিলেন জমিনের সর্বত্র ন্যায় বিচারের বৃষ্টি বর্ষণকারী এবং সভ্যতা দ্বারাই সম্পদের প্রাচুর্যের প্রতিনিধিত্বকারী আল্লাহর বিশাল রাজত্বের চুড়াকে অকাট্য কিতাবের আয়তপঞ্চ দ্বারা শক্তিশালী করা হয়েছে।’

কাব্য নাট্য

আরবী কাব্যনাট্য আধুনিক আরবি সাহিত্যের ইতিহাসে নতুন সংযোজন। কবি আহমাদ শাওকীই সর্বপ্রথম আরব কাব্যঙ্গনে নাট্যগীতির অভিনব ধারা সফল ভাবে সংযোজন করেন। তাঁর পূর্বে কেউ কেউ নাট্য গীতি রচনা করলেও তারা তাতে সফল হননি। আহমাদ মুহাররাম এক্ষেত্রে প্রচেষ্টা বিনিয়োগ করেছেন ঠিকই কিন্তু তা সফলতায় পৌছায় নি। আহমাদ মুহাররাম দুটি কাব্য নাট্য রচনা করেছেন। তন্মেধ্যে একটি হলো ‘‘ ’’ (বার্মাকীদের দূর্ভোগ)। এটি পাঁটি অধ্যায়ে বিভক্ত। অভিনয়ের জন্য রচিত হলেও তা মঞ্চস্থ হয়নি। কারণ এ ধরনের নতুন সাহিত্য সৃষ্টি হয়তবা তাঁর সমাজে গ্রহণীয় হয়নি। অপর কাব্য নাট্যটি হলো ‘রাসূলের মুয়াযযিন বিলাল’[২০]

তথ্যসূত্র

১। মুহাম্মদ ইবনে সা'দ ইবনে হুসাইন, *আল-আদব আল-হাদীছ তারীখ ওয়া দিরাসাত*, পৃ. ২০৫।

২। আহমাদ মুহাররাম, *দিওয়ানু মাজদিল ইসলাম*, পৃ. ৯-২৯।

৩। মুহাম্মদ ইবন সা'দ ইবন হুসাইন, *আল-আদব আল-হাদীছ তারীখ ওয়া দিরাসাত*, পৃ. ২০৫।

৪। মুহাম্মদ ইবন সা'দ ইবনে হুসাইন, *আল-আদব আল-আরবী ওয়া তারীখুহু* (আল-আছর, আল-*হাদীছ)*, পৃ. ৬৪।

৫। মুহাম্মদ ইবন সা'দ ইবন হুসাইন, *আল-আদব আল-হাদীছ তারীখ ওয়া দিরাসাত*, পৃ. ২০৬।

৬। মুহাম্মদ ইবন সা'দ ইবন হুসাইন, *আল-আদব আল-হাদীছ তারীখ ওয়া দিরাসাত*, পৃ. ২০৬।

৭। মুহাম্মদ ইবন সা'দ ইবন হুসাইন, *আল-আদব আল-আরবী ওয়া তারীখুহু (আল-আছর, আল-হাদীছ)*, পৃ. ৬৫

৮। আহমাদ আব্দুল লতীফ আল-জাদা ওয়া হুসনী আদ্হাম জারার, *শু'আরা আল-দা'ওয়াত আল-ইসলামিয়্যা ফি আল-আসর আল-হাদীছ*, পৃ. ৬৯।

৯। ড. আহমদ আলী, *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস*, পৃ. ১১২-১১৩।

১০। ওমর আল দাসুকি, *ফি আল-আদাব আল-হাদীস*, পৃ. ১৫৬।

১১। ওমর আল দাসুকি, *ফি আল-আদাব আল-হাদীস*, পৃ. ১৫৬।

১২। আহমাদ আব্দুল লতীফ আল-জাদা ওয়া হুসনী আদ্হাম জারার, *শু'আরা আল-দা'ওয়াত আল-ইসলামিয়্যা ফি আল-আসর আল-হাদীছ*, পৃ. ৬৮।

১৩। আহমাদ মুহাররাম, *দিওয়ানু মাজদিল ইসলাম*, পৃ.২৬।

১৪। আহমাদ মুহাররাম, *দিওয়ানু মাজদিল ইসলাম*, পৃ. ২১

১৫। ড. আহমদ আলী, *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস*, পৃ. ১৫৬।

১৬। আহমাদ মুহাররাম, *দিওয়ানু মাজদিল ইসলাম*, পৃ. ১৪।

১৭। আবু সাঈদ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, কাজী নজরুল ইসলাম ও হাফিয ইব্রাহিমের কবিতায় ইসলামী উপাদান: তুলনামূলক পর্যালোচনা, পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২।

১৮। মুহাম্মদ ফরীদ পাশা (১৮৬৭-১৯১৯) বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে সক্রিয় মিশরীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ। তুর্কী অভিজাত পরিবারের জন্ম গ্রহণ করার পর আহলিয়্যা আদালতে আইনজীবীর জীবন আরম্ভ করেন এবং এরপর মিশরে উপর ইংরেজ অছিগিরি বিরোধী জাতীয়তাবাদী নেতা ও ১৯০৭ সালে ন্যাশনালিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মুস্তফা কামিল পাশার সমর্থক হন। ১৯০৮ সালে প্রারম্ভে মুস্তফা কামির পাশা ইন্তেকাল করলে মুহাম্মদ ফরিদ দলের নেতা হিসেবে তার স্থলাভিষিক্ত হন। মুহাম্মদ ফরিদ একজন সাহিত্যিক ছিলেন। খেদীভ পরিবারের উসমানী ও রোম সাম্রাজ্য সম্পর্কিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ এবং ১৯০১-১৯০৪ সালে তার উত্তর আফ্রিকা ও ইতালি ভ্রমন বিষয়ক গ্রন্থেরও প্রণেতা ছিলেন। তিনি ১৯১৯ সালে বার্লিনে ইন্তেকাল করেন (ইসলামি বিশ্বকোষ), ২১শ খন্ড, পৃ.২৪০।

১৯। আহমাদ মুহাররাম, *দিওয়ানু মাজদিল ইসলাম*, পৃ. ১৩।

২০। মুহাম্মদ ইবনে সা'দ ইবন হুসাইন, আল-আদব আল-হাদীছ তারীখ ওয়া দিরাসাত, পৃ. ৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আহমাদ মুহাররামের কবিতায় ইসলামী চেতনার নানাদিক

ভূমিকা

আধুনিক আরবী সাহিত্যের কবি, আরবত্ব ও ইসলামী কবি (شاعر العروبة والإسلام) আহমাদ মুহারাম অসামান্য কাব্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক কোন সনদ না থাকলেও আহমাদ মুহাররাম স্বীয় জন্মগত মেধা ও তীক্ষ্ণ প্রতিভা বলে কবিগুরু আহমদ শাওকী ও জাতীয় কবি হাফিজ ইব্রাহিমের সমসাময়িক হয়েও কাব্যঙ্গনে নিজস্ব বলয় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। তীব্র ধর্মীয় চেতনা, ঈমানী জোশ, তৎকালীন রাজনৈতিক দ্বিধা, আর্থিক দূরাবস্থা, যুদ্ধ, ধ্বংস, সাংস্কৃতিক সংকট-এই ঐতিহাসিক পটভূমিতে আহমাদ মুহাররামের কবি প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। ধূমকেতুর মতোই তিনি আরবী কাব্য-গগনকে মহূর্তের জন্য উদ্দীপ্ত করে চিরকালের মতো নিস্প্রভ হয়ে গেছেন। তবে পশ্চাতে রেখে গেছেন ইসলামী সাহিত্যের এক মহাভান্ডার। নিম্নে তার কাব্যালোকে ইসলামী চেতনার নানাদিক নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

মুহাম্মদ (সা.) এর আগমন ও ইসলামের দাওয়াত

ইসলামের বার্তাবাহক হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আগমন, ইসলামের দাওয়াত, লাত, মানাত, ওজ্জার অসারতা ও ইসলাম প্রচার থেকে তাঁকে বিরত রাখার জন্য কাফিরদের প্রলোভন ও মুহাম্মদ (সা.) এর প্রত্যাখ্যান ইত্যাদি বিষয় সম্বলিত এক দীর্ঘ কবিতার নাম مطلع النور الأول من أفق الدعوة الإسلامية (ইসলামী দাওয়াতের দিগন্ত থেকে প্রথম নূরের উদয়) যেমন কবি বলেন-[১]

إملإ الإرض يا محمد نورا واغمر الناس حكمة والدهورا
حجبتك الغيوب سرا تجلى يكشف الحجب كلها والستورا
عب سيل الفساد في كل واد فتدفق عليه حتى يغورا
جئت ترمى عبابه بعباب راح يطوى سيوله والبحورا
ينقذ العالم الغريق يحمى **أمم الأرض ان تذوق الثبورا**
زاخر يشمل البسيطة مدا ويعم السبع الطباق هديرا
أنت معنى الوجود، بل أنت سر جهل الناس قلبه الأكسيرا
أنت أنشأت للنفوس حياة غبرت كل كائن تغييرا
انجب الدهر في ظلالك عصرا نابه الذكر في العصور شهيرا
كيف تجزى جميل صنعك دنيا كنت بعثا لها، وكنت نشورا؟

أنكر الناس ربهم وتولوا يحسبون الحياة إفكا وزورا

أين من شرعة الحياة أناس **جعلوا البغى شرعة والفجورا؟**

تلك أربابهم: أتملك أن تنـ ـفع مثقال ذرة أو تضيرا؟

قهروها **صناعة، اعجب الأر** باب ما كان عاجزا مقهورا

ما لدى اللات أو منة أو لعز ى غناء لمن يقيس الأمورا

جاء دين الهدى وهب رسول الله يحمى لواءه المنشورا

جاءه عمه يقول: أترضى أن يقيموك سيدا أو أميرا؟

ويصبوا عليك من صفوة الما ل حيا ماطرا، وغيثا غزيرا؟

قال: يا عم ما بعثت لدينا أبتغيها، وما خلقت حصورا

لو أتونى بالنيرين لأعرضـ ـت أريهم مطالبى والشقورا

'হে মুহাম্মদ। তুমি নূর দ্বারা এই পৃথিবীকে পরিপূর্ণ কর। যুগ ও যুগের মানুষকে হেকমত দ্বারা পরিপূর্ণ কর। অদৃশ্য শক্তি তোমাকে রহস্যাবৃত করে রেখেছিল। অত:পর তা স্পষ্ট হয়ে গেল এবং সকল পর্দা ও আবরণকে উন্মোচিত করেছিল। অনিষ্ঠতার প্রবাহ সকল উপত্যকায় প্রবল হয়েছে, ফলে তা উপত্যাকার উপর দিয়ে জোরে প্রবাহিত হয়েছে, অনন্তর তা ডুবে গেছে। তুমি আগমন করে বিবাদের তরঙ্গের মুকাবালায় (সত্যের) তরঙ্গ নিক্ষেপ করেছ, ফলে অসত্যের প্রবাহ ও তার সাগর ভাজ হতে শুরু করেছে। তিনি পাপ পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত জগতকে উদ্ধার করেছেন এবং পৃথিবীর জাতিসমূহকে ধ্বংস আস্বাদন করা থেকে রক্ষা করেছেন। তাঁর উদারতা সমগ্র বিশ্বকে শামীল করে এবং তাঁর আহবান সপ্তস্তর ব্যাপকতা লাভ করে। তুমিই (সমগ্র) অস্তিত্বের তাৎপর্য তুমিই রহস্য, অথচ মানুষের অন্তর (এই) পরশমনি সম্পর্কে অজ্ঞ। তুমি সকল সত্ত্বায় এমন প্রাণ সঞ্চার করেছ যা সমগ্র সৃষ্টিকুলকে বদলিয়ে দিয়েছে। মহাকল তোমার ছায়া তলে যুগযুগ ধরে সম্ভ্রান্ত হয়েছে এবং যুগে যুগে তোমার আলোচনা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। দুনিয়া কিভাবে তোমার সুন্দর কাজের প্রতিদান দিবে? তুমি তো তার (দুনিয়া) জন্যই প্রেরিত হয়েছিলে। আবার যদি তুমি পুনরুত্থিত হতে। মানব জাতি তোমার প্রভূকে অস্বীকার করেছে এবং তারা বিমুকতা অবলম্বন করেছে। তারা মনে করে জীবনটা অবাস্তব ও মিথ্যা। ধর্মীয় জীবন বিধান ছেড়ে মানুষ কোথায় যাবে? তারা এ ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও অন্যায় করেছে। ঐ প্রতিমাগুলো তাদের প্রভূ। ওগুলো কি বিন্দু পরিমান উপকার কিংবা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে? তারা তো ঐ প্রতিমাগুলোকে প্রতিমা হতে বাধ্য করেছে। ঐ গুলো কতইনা আশ্চর্য জনক মা'বুদ। যারা নিজেরাই অক্ষম ও বশীভূত। যে ব্যক্তি ধর্মীয় বিষয় সমূহকে তুলনা করছে সে জানতে পেরেছে যে লাত, মানাত ও ওজ্জার কাছে

কোন প্রাচুর্য নেই। সত্যদ্বীন আগমন করেছে ফলে আল্লাহর রাসুল তার নির্দেশনা সম্বলিত ঝান্ডার পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেছেন। তাঁর চাচা তাঁর নিকট আগমন করে বলল তুমি কি সন্তুষ্ট হবে যে তারা তোমাকে নেতা কিংবা আমীর বানাবে? এবং তারা উৎকৃষ্ট বিপুল পরিমানের সম্পদ তোমার জন্য একত্রিত করে দিবে? তিনি বললেন: হে চাচা আমি দুনিয়াতে ঐ সকল সম্পদের কামনায় প্রেরিত হয়নি এবং আমাকে সংকীর্ণমনা করেও সৃষ্টি করা হয়নি। যদি তারা আমার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তাদেরকে সত্যের পথ দেখানো থেকে বিরত হব না।'

মহানবী (সা.) এর হেরাগুহায় অবস্থান ও ওহী আগমন

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বছর একমাস হেরা গুহায় কাটাতেন এবং এভাবে নির্জনে একাগ্রচিত্তে আল্লাহর ইবাদত মশগুল থাকতেন।

অত:পর নবুয়াত প্রাপ্তির রমযান মসে তিনি যখন হেরা গুহায় অবস্থান করছিলেন তখন তাঁর কাছে আল্লাহর তরফ থেকে পরম সম্মান ও মর্যাদার বানী বহন করে হযরত জিব্রাইল (আ.) এলেন এবং সূরা আলাকের প্রথম ৫টি আয়াত পড়ে শুনালেন।[২] উক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে আহমদ মুহাররাম শিরোনামে একটি কবিতা রচনা করেন। তার অংশ বিশেষ নিম্নরূপ

ظل مستخفيا بغار حراء يعبد الله عائذا مستجيرا

يسمر القوم في الضلال ويمسى للذي أطلع النجوم سميرا

راكعا ساجدا يسبح مولا ه، ويزجي التهليل والتكيرا

تهتف الكائنات، يأخذها الصو ت، تحيى مكانه المهجورا

نال منها محلة لم ينلها صوت داود حين يتلو الزبورا

'তিনি হেরাগুহায় আত্মগোপন করে সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনাকারী অবস্থায় আল্লাহর ইবাদত করতেন। ভ্রষ্ঠতায় নিমজ্জিত কাফির সম্প্রদায় রাত্রে তাঁর বিরুদ্ধে কুপরামর্শ করে এবং তিনি (মুহাম্মদ (সা.) ঐ সত্ত্বার জন্য সন্ধ্যান করেন যিনি নক্ষত্ররাজিকে নৈশ আলাপের সঙ্গী হিসেবে উদিত করেন। তিনি রুকু সিজদাকারী অবস্থায় তাঁর প্রভূর তাসবীহ পাঠ করেন এবং তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু) ও তাকবীর (আল্লাহু আকবার) পেশ করেন। সকল সৃষ্টি উল্লাস প্রকাশ করে। তার হেদায়াতের আওয়াজ সকল সৃষ্টিকুলকে সন্নিবেশিত করে। তিনি হেরাগুহা থেকে এমন একটি মর্যাদার আসন লাভ করেন যে পর্যন্ত দাউদ (আ.) এর যবুর পাঠের আওয়াজ পৌঁছায়নি।

দ্বীনের কেন্দ্র দারুল আরকাম ও ওমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণ

আরকাম ইবনে আবুল আরকাম মাখযুমীর ঘরদুস্কৃতিকারীদের দৃষ্টি এবং তাদের মজলিশ সমাবেশ থেকে দূরে সাফা পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিলো। এ কারণে নবী (সা.) নবুয়াতের পঞ্চম বছর থেকে দ্বারে আরকামকে দ্বীনের দাওয়াত এবং মুসলমানদের সাথে মেলামেশার কেন্দ্র রুপে নির্ধারন করেন।[৩] উক্ত গৃহে ওমর (রা.) আগমন করে রাসুল (সা.) এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণের ফলে ইসলামের শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। মুসলমানরা প্রকাশ্যে ইবাদত বন্দেগী করতে লাগলেন। এ সকল বিবরণ সম্বলিত কবিতাটি হলো في دار الأرقم بن أبي الأرقم যেমন-[৪]

ودعا الأرقم لستجب، تلك داري	تسع الدين محرجا محصورا
وافها، واجمع المصلين فيها	عصبة إن أردت، أو جمهورا
وأتى ابن الخطاب يؤمن يا	لله ويختار دينه المأثورا
قال: كلا، لن يعبد الله سرا	ويرى نور دينه مستورا
أخرجوا في حمى الكتاب أسودا	واطلعوا في سنا النبي بدورا
ذلكم بينكم، فصلوا وطوفوا	لا تخافن مشركا أو كفورا

'আরকাম আহবান করল, তুমি তার ডাকে সাড়া দাও, ঐ যে আমার গৃহ, দ্বীন আজ সমস্যা সঙ্কুল ও অবরুদ্ধ অবস্থায় বিদ্যমান। তুমি দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দাও, যদি তুমি চাও তাহলে সকল নামাজীদেরকে দ্বীনের মধ্যে দলে দলে সমবেত কর। আল্লাহর প্রতি ঈমান নিয়ে খাত্তাবের ছেলে এসেছে এবং সে আল্লাহর মনোনীত দ্বীনকে পছন্দ করেছে। সে বলল কখনো আল্লাহর ইবাদত গোপনে করা হবে না এবং আল্লাহর দ্বীনের জ্যোতি দেখানো হয়েছে আচ্ছাদিত অবস্থায়। তোমরা আল্লাহর কিতাব রক্ষায় সিংহের ন্যায় বেরিয়ে আস এবং নবুয়তের নূরে চন্দ্রের ন্যায় আবির্ভূত হও। ঐ যে তোমাদের গৃহ। তোমরা তথায় নামাজ পড় এবং তাওয়াফ কর। কাফির এবং মুশরিকদেরকে ভয় করবে না।

রাসুল (সা.) কে হত্যার ষড়যন্ত্র ও মদীনায় হিজরত

ইসলামের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি সহ্য করতে না পেরে মক্কার কাফিররা মুহাম্মদ (সা.) কে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। অপর দিকে জিব্রাইল (আ.) ওহী নিয়ে হাজির হন এবং কোরাইশদের ষড়যন্ত্রের কথা অবহিত করে আল্লাহর পক্ষ থেকে হিজরতের অনুমতির কথা জানিয়ে দেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র

করে আহমাদ মুহাররাম রচনা করেছেন إرادة قتل الرسول وهجرته إلى المدينة শিরোনামে এক দীর্ঘ কবিতা। তার অংশ বিশেষ নিম্নরূপ[৫]

أجمعوا أمرهم، قالوا: هو القتـ ـل يميط الأذى ويشفى الصدورا

لا وربي، فإنماطلب الكفـ ـار بسلا، وحاولوا محظورا

إن نفس الرسول أمنع جارا من طواغينهم، وأقوى بجيرا

مالهم؟ هل رمى النبي ترابا أم عمى في عيونهم مذرورا؟

ذهلوا مدة، فلما أفاقوا أنكروها دهياء عزت نظيرا

ينفضون التراب، من مس منا كل وجه فردوه معفورا؟

أين كنا؟ ما بالنا لا نراه؟ ما لأوصالنا تمس الفتورا؟

أمن الحادثات ما يذهل العا قل عن نفسه، ويعمى البصيرا؟

'তারা তাদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে একমত হলো এবং বলল: তাকে (মুহাম্মদ সা.) হত্যাই কেবল আমাদের কষ্টকে দুর করে দিবে এবং অন্তরসমূহেকে আরোগ্য দান করবে। না, আমার রবের কসম (কখনোই তা ঘটবে না), অবশ্য কাফিররা অন্যায়ভাবে বীরত্ব দেখাতে এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে। নিশ্চয় রাসুল (সা.) এর অন্তর তাদের (কাফিরদের) অবাধ্যতার প্রতিবেশী হওয়া থেকে অধিক বিরত রয়েছে এবং তিনি আশ্রায়দানে অধিক শক্তিশালী। তাদের কি হলো? রাসূল (সা.) কি তাদের চক্ষুসমূহেকে গুড়োমাটি কিংবা অন্ধকত্ব নিক্ষেপ করেছেন? তারা কিছু সময় বিস্ময়াবিভূত হলো, অত:পর যখন তাদের হুশ ফিরে এলো তখন তারা উক্ত কর্মকে ধূর্তমী বলে ঘৃনা করল। তবে তা ইসলামের পক্ষের উদাহরণকেই সুদৃঢ় করল। তার প্রত্যেক তাদের চেহারা থেকে ধূলিবালি ঝেড়ে ফেলল এবং বলল আমাদের মধ্যে কে আছে যে, ধূলির জবাব দিবে? এটা কোন ধরনের ঘটনা যা খোদ বুদ্ধিমানকে হতবুদ্ধি করে এবং দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিকে অন্ধ করে দেয়?

আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)

সমগ্র মানব জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা সেখানে নানা রকমের সংস্কারকের সাক্ষাত পাই। দেখতে পাই অনেক মিষ্টভাষী অথবা অনলবর্ষী বক্তা, দার্শনিক ও চিন্তাবিদ, বিশাল সাম্রাজ্যের স্থপতি, রাজা মহারাজা ও সম্রাট, দিগ্বিজয়ী বীর, বড় বড় দল ও সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা, মানব সভ্যতার আলোড়ন সৃষ্টিকারী মহানায়ক, সমাজ কাঠামোতে বারবার তোলপাড় সৃষ্টিকারী দোর্দন্ড প্রতাপশালী বিপ্লবী, সভ্যতার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত নিত্য নতুন ধর্মমতের প্রবর্তক এবং নৈতিক সংস্কারক ও আইন প্রণেতা। কিন্তু তাদের রেখে যাওয়া কীর্তি ও অবদানের ফলাফলের দিকে তাকালে যর্থার্থ কল্যাণ ও সুফল দেখতে পাই না। কিন্তু মহানবীর

জীবনাদর্শের দিকে তাকালে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, প্রকৃত পক্ষে মহানবীর হাতেই সাধিত হয়েছিল মানব জাতির সর্বাত্মক পুনরুত্থান। সত্য ও ন্যায়ের এক স্বর্ণোজ্বল প্রভাতের অভ্যুদয় ঘটিয়ে তিনি সভ্যতার আকাশকে করেছিলেন মেঘমুক্ত। এই মহামানবকে কেন্দ্র করে আমাদের কবি আহমাদ মুহাররাম রচনা করেছেন محمد رسول الله শিরোনামে এক সুদীর্ঘ কাসীদা। নিম্নে তার অংশ বিশেষ উল্লেখ করা হলো।[৬]

هذا إمام الدين في أعلامه — والدين معتصم ببأس إمامه

يحمى حقيقته بقوة بطشه — ويصون بيضته بحد حسامه

شيخ الجهاد يود كل مجاهد — لو كان يدعى في الوغى بغلامه

على اللواء يقيمه بحدوده — ويبين المأثور من أحكامه

المصلحون على الزمان سيوفه — وجنوده في حربه وسلامه

عرفوا الجهاد به، ومنه تعلموا — ما صح من دستوره ونظامه

غضبت قريش أن جفا أصنامها — ووفى بعهد إلهه وذمامه

يغزو فوارسهم ويقتل جمعهم — حتى يدين مرامهم لمرامه

ويرى المحجة كل غاو منهم — فكيف عن طغيانه وعرامه

ويثوب جاهلهم إلى دين الهدى — والنور من دين العمى وظلامه

دلقوا إليه، وظن أكذبهم منى — أن قد سقته يداه كأس حمامه

أكذاك ينخدع الغبي وهكذا — يتخبط المفتون في أوهامه؟

‘তিনি (মুহাম্মদ সা.) হলেন দ্বীনে ইমাম। আর দ্বীনের শক্তিশালী হয় তার ইমামের শক্তিমত্তার দ্বারা। তিনি তাঁর প্রভাবের দ্বারা দ্বীনের প্রকৃত অবস্থা রক্ষা করেন এবং ধারালো তরবারি দ্বারা তার শুভ্রতাকে হেফাযত করেন। তিনি হলেন জিহাদের সেনাপতি। প্রত্যেক মুজাহিদ এটাই কামনা করত, যদিও তাকে যুদ্ধের ময়দানে দ্বীনের গোলাম সম্বোধনে ডাকা হত। তিনি ধর্মের সীমানা দ্বারা সুউচ্চ পতাকা স্থাপন করেছেন এবং ধর্মের হুকুম সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। যুগের সংস্কারকরা হলেন তাঁর তরবারি এবং দ্বীনের নিরাপত্তা ও ধর্মযুদ্ধের ক্ষেত্রে তাঁর সৈনিক। সংস্কারকরা তাঁর (মুহাম্মদ সা.) দ্বারাই জিহাদের পরিচিতি লাভ করেছে এবং দ্বীনের ব্যবস্থাপনা ও সংবিধানের সঠিক দিকগুলো তাঁর থেকেই শিক্ষা লাভ করেছে। তিনি কুরায়শদের মূর্তির প্রতি নির্দয় ব্যবহার করায় তারা তাঁর প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছে। তবে তিনি তাঁর প্রভূর সাথে কৃত অঙ্গীকার ও দাবী পূর্ণ করেছেন। তিনি তাদের অশ্বারোহীদের পরাভতি করেন এবং সকলকে হত্যা করেন। অনন্তর তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য তাঁর লক্ষ্য উদ্দেশ্যের কারণে অনুগত হয় (হীন হয়)। তাদের প্রত্যেক পথভ্রষ্ট ব্যক্তিই সত্যের পথ

দেখে, ফলে দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও প্রচন্ডতা প্রদর্শন থেকে বিরত হয়। ভ্রান্ত দ্বীন ও তার আধার থেকে তাদের (কাফিরদের) মুর্খরা সত্য ও আলোকিত দ্বীনের দিকে ফিরে আসে। তারা ধীর কদমে সত্যের দিকে এগিয়ে এল, তবে তাদের অধিক মিথ্যাবাদীরা ধারণা করল যে, তার হস্তদ্বয় তাকে মৃত্যুর পিয়ালা পান করিয়েছে। এভাবেই কি নির্বোধ লোকেরা ধোকা খায়? এবং পরীক্ষিত ব্যক্তিরা তার ভ্রান্ত ধারণার মাঝে উদ্দেশ্যহীন ভাবের ঘুরাঘুরি করে?'

ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ

ইসলামী ইতিহাসে ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে অন্যতম বদর যুদ্ধ। এই যুদ্ধ সম্বন্ধে আহমাদ মুহাররাম দীর্ঘ ২১ পৃষ্ঠাব্যাপী কবিতা রচনা করেছেন। ইসলামের ইতিহাসে এই যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এটি কাফিরদের মুকাবিলায় মুসলমানদের প্রথম সম্মুখ যুদ্ধ। এখানে আমি উক্ত দীর্ঘ কবিতার ঐ অংশটুকু উপস্থাপন করার ইচ্ছা পোষণ করছি, যে অংশে মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর কাছে যুদ্ধ জয়ের প্রার্থনা করলেন ফলে আল্লাহ তা'য়ালা বৃষ্টি বর্ষণে জমিনকে দৃঢ় করে দিলেন, ফেরেস্তারা মুসলমানদের কাতারে যুদ্ধের জন্য প্রবেশ করল এবং যুদ্ধের তীব্রতা প্রবল রূপ ধারণ করল।[৭] যেমন কবি বলেন-

أفما رأيت أبا عبيدة ثائرة   وأبوه في يده يتل ويسط

صلب القرا ضخم للسنام مكبح؟   بطل تخطر لم تخطر مصعب

أرأيت إذ هزم النبي جموعهم   فكأنما هزم البغاث المضرح

هي حفنة للمشركين من الحصى   خف الوقور لها وطاش المرجح

مثل الثميلة من مجاجة نافث   وكأنما هي صيب يتبذح

الله أرسل في السحاب كتيبة   تهفو كما هفت البروق اللمح

تهوى مجلجلة تلهب أعين   منها وتقذف بالعواصف أجنح

للخيل حمحمة تراع لهولها   صيد الفوارس والعتاف القراح

حيزوم أقدم، إنما هي كرة   عجلى تجاذبك العنان فتمرح

جبريل يضرب والملائك حوله   صف ترض به الصفوف وترضح

تلك الحصون المانعات بمثلها   تذرى المعاقل والحصون وتذرح

للقوم من أعناقهم وبنائهم   نار تريك الداء كيف يبرح

جفت جذور الجاهلية والنوى   هذا النبات الناضر المسترشح

طفق الثرى من حولها لما ارتوى من ذنوب مهجتها يجف ويبلح

'তুমি কি বিক্ষুব্ধ আবু উবায়দাকে দেখনি; এমতাবস্থায় যে তার পিতা তারই হাতে ভুতলশায়ী ও ধরাশায়ী হয়ে রয়েছে। তিনি (আবু উবায়দা) এমন একজন বীর যিনি স্বদম্ভে তরবারি চালনা করেন, নাকি মুসআব স্বদম্ভে তরবারি চালনা করেন যিনি মজবুত পৃষ্টদেশ ও শক্ত কোমরের অধিকারী? তুমি কি দেখনি যখন নবী (সা.) তাদের (কাফিরদের) দলটিকে পরাজিত করলেন। এ যেন বাজপাখি শকুনের দলকে পরাজিত করল। (অর্থাৎ ক্ষুদ্র একটি বাহিনী বৃহৎ একটি বাহিনীকে পরাজিত করে ফেলল)। এই (পরাজয়) মুশরিকদের জন্য এক মুষ্টি নুড়ি পাথরের সদৃশ ছিল। যার ফলে (তাদের ঐক্যের) ফাটল সহজতর হয়ে গেল এবং বিজয় লক্ষ্যচ্যুত হয়ে গেল। (পরাজয়) থুথু নিক্ষেপকারীর অবশিষ্টাংশ থুথু সদৃশ ছিল। আর যেন সেই (পরাজয়) একটি মেঘমালা যা বৃষ্টিবর্ষণ করেছে। (অর্থাৎ কাফিরদের শৌর্য-বীর্য ধুয়ে নিয়ে গেছে।) আল্লাহ তা'য়ালা মেঘমালার ন্যায় (ফেরেশতার) বাহিনী প্রেরণ করলেন। আর সেই বাহিনী মাটিতে ধাবিত হল যেমনিভাবে আলোকময় বিজলী ধাবিত হয়ে থাকে। সেই বাহিনী ঝনঝন শব্দে নিচে নেমে আসে। যার কারণে চক্ষুগুলো ঝলসে যায়। আর ফেরেশতার ডানাগুলো প্রবল ঘূর্ণিঝড় নিয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। (বাহিনীর) ঘোড়াগুলো হ্রেষাধ্বনি করছিল। ফলে (কাফের) অশ্বারোহীদের শিকারী অশ্ব এবং উচ্চ বংশীয় মজবুরত খুর বিশিষ্ট প্রাণীগুলো (বাহিনীর অশ্বের হ্রেষাধ্বনির) ভয়ে আতংকিত হয়ে গেল। বাহিনীর সম্মুখ ভাগ খুবই অগ্রগামী ছিল। আর যেন সেই (বাহিনীর আক্রমণ) এমন এক আক্রমন যা তোমাকে লাগাম ধরে টেনে নিয়ে যাবে। অত:পর উল্লাস প্রকাশ করবে। জিবরাঈল (আ:) জমিন অতিক্রম করছেন। আর ফেরেশতারা তার চারপাশে সারিবদ্ধ; ফলে ফেরেশতাদের সারির প্রভাবে কাফিরদের সারি চূর্ণ বিচুর্ণ বা খান খান হয়ে গেল। এই ফেরেশতাদের বাহিনীগুলো মজবুত প্রতিরক্ষা বুহ্য। আর এমন প্রতিরক্ষা বুহ্য দিয়েই অন্যান্য দূর্গ সমূহকে উড়িয়ে দেওয়া যায়। কাফের সম্প্রদায়ের গ্রীবা ও আঙ্গুলে অস্ত্রের আঘাত লেগে রয়েছে যা তোমাকে তাদের অসুস্থতা দেখিয়ে দেয়। আর সেই অসুস্থতা কিভাবে সারাবে বা দূরীভূত হবে। জাহেলী যুগের শিকড়গুলো শুকিয়ে গেছে। আর তাওহীদের সতেজ, বৃদ্ধি প্রাপ্ত চারটি উপরে ওঠে। (তাওহীদের চারাটির) চারিপাশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করল। যখন সে তার ভিতরের তরল পদার্থ থেকে পরিতৃপ্ত হলে। যে চারটি শুকিয়ে শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল।'

মক্কা বিজয়

মক্কা বিজয় ইসলামের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এটি ৮ম হিজরীতে সংঘটিত হয়। এ প্রসঙ্গে আহমাদ মুহাররাম বলেন।[৯]

الله أكبر، جاء الفتح، وابتهجت للمؤمنين نفوس، سرها وشقى

مشى النبي يحف النصر موكبه مشيعا بجلال الله مكتيفا

Dhaka University Institutional Repository

أضحيى أسامة من بين الصحاب له ردفا، فكان أعز الناس مرتدفا

لم يبق إذ سعطت أنوار غرته مغنى بمكة إلا إهتزأ ووجفا

تحرك البيت، حتى لوتطاوعه أركانه خف يلقى ركبه شغفا

وافاه في صحبه من كل مزدلف فلم يدع فيه للكفار مزدلفا

العاكفون على الأصنام أضحكهم أن الهون على أصنافهم عكفا

كانوا يظنون ألا يستباح لها حمى، فلاشمما أبدت ولا أنفا

نامت شياطينها عنها منعمة وبات ما ردها بالخزى ملتحفا

هوت تفاريق، وانقضت محطمة كأنها لم تكن إذا أصبحت كسفا

لم يبق بالبيت أصنام ولا صوى زال العمى، وإستحال الأمر فاختلفا

للجاهلية رسم كان يعجبها في دهرها فعفت أيامها وعفا

لا كنت يا زمن الأوهام من زمن أرخى على الناس من ظلمائه سجفا

إن الشريد الذي قد كان يظلمه ذو قرابته قد عاد فانتصفا

رد الظلامة في رفق وإن عفوا ولو يشاء اذا الاشتد أو عنفا

إن الرسول لسمح ذو رمياسر إذا تملك اعناق الجناة عفا

شكرا محمد إن الله اسبغها عليك تعمى ترامى ظلها وضفا

وعد وفي لإمام المرسلين به و الله إن وعد الرسول الكرام وفي

‘আল্লাহ মহান, বিজয় সম্পন্ন হয়েছে। ফলে বিশ্বাসীদের অন্তর প্রফুল্ল হয়েছে। আর বিজয় আনন্দ বিশ্বাসীদের অন্তর ভরে দিয়েছে এবং কাফিরদের অত্যাচারে জর্জরিত ক্ষত বিক্ষত হৃদয়কে আরোগ্য করে দিয়েছে। খোদার মহিমায় নবী (সা.) সহযোগী ও সঙ্গী পরিবেষ্টিত অবস্থায় (বিজয়ের জন্য) চলছেন। আর তাঁর অভিযাত্রী দলকে খোদার সাহায্য বেষ্টন করে রেখেছে। সাহাবাদের মাঝে উসামা বিন যায়েদ রাসূলের সহযাত্রী হলেন। আর তিনি মানুষের মাঝে সবচেয়ে সম্মানিত সহযাত্রী হিসেবে পরিগণিত হলেন। যখন রাসূলের (সা.) উজ্জ্বল আলো প্রকাশিত হল। তখন সকল মুসলিম গৃহ (আনন্দে) আন্দোলিত হল এবং কাফিরদের গৃহ ভয়ে প্রকম্পিত হল। কাবা শরীফ আন্দোলিত হয়েছে। আর তার স্তম্ভগুলো যদি তার অনুসরণ করতো তাহলে আরোহীর সাথে তীব্র ভালবাসার সাক্ষাত সহজহর হয়ে যেত। তিনি (রাসুল সা.) সঙ্গীদের নিয়ে প্রতিটি স্থানে উপস্থিত হলেন। অবশেষে কাফিরদের জন্য কোন জায়গা খালি রাখেননি। (অর্থাৎ সকল স্থানেই বিজয় সুচিত

হল। কোন স্থান কাফিরদের দখলে ছিল না।) তারা (কাফিররা) প্রতিমাদর প্রতি নিবেদিত প্রাণ ছিল। আর এটা তাদেরকে হাসিয়েছে যে, তাদের প্রতিমাদের প্রতি নিবেদিত প্রাণ হওয়াটা ছিল চরম লাঞ্ছনা। (অর্থাৎ প্রতিমাদের প্রতি নিবেদিত প্রাণ হওয়াটাই ছিল তাদের লাঞ্ছনার কারণ তারা (কাফিররা) ধারণা করেছিল যে, প্রতিমাদের প্রতি কোন ধরনের অনিষ্ঠতা বৈধ মনে করা যাবে না। (কিন্তু মক্কা বিজয়ের সময় প্রতিমাগুলো চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার কারণে) তারা আর কোন গর্ব প্রকাশ করতে পারেনি। কাফিরদের নেতারা তাদের থেকে নিরাপদে ঘুমিয়ে পড়ল। আর তাদের মধ্যে বড় প্রতিমাটি (হুবল) অপমান ও লাঞ্ছনায় আচ্ছাদিত হয়ে রাত্রি যাপন করল। (কাফির ও প্রতিমাদের মাঝে) বিভাজন নেমে এসেছে এবং ভাঙ্গন সম্পন্ন হয়ে গেছে। আর যখন এগুলো খন্ড বিখন্ড হয়ে গেল তখন মনে হল এগুলো কিছুই ছিল না। (অর্থাৎ সেগুলোর যেন কোন অস্তিত্ব ছিল না।) (মক্কা বিজয়ের ফলে) কাবা শরীফে কোন প্রতিমা ও প্রতিকৃতি অবশিষ্ট থাকে নি। ফলে ভ্রষ্টতা দূরীভূত হয়ে গেছে এবং অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। জাহেলী যুগের কতিপয় রীতি ছিল যা সেই যুগে কাফেরদেরকে মুগ্ধ করে দিত। (মক্কা বিজয়ের ফলে) সেই যুগের অবসান ঘটেছে এবং সেই রীতিগুলোও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। হে যুগের ভ্রষ্টতার ধারণা! আমি তো মানুষের মাঝে ভ্রষ্টতার পর্দা ঝুলিয়ে রাখিনি। বিতাড়িত ব্যক্তি (নবী সাঃ) যার উপর তার আত্মীয়স্বজন অত্যাচার করেছিল। তিনি ফিরে এসে সকলের মাঝে ইনসাফ কায়েম করেছেন। তিনি (নবী) সহানুভূতির মাধ্যমে অন্যায় আচরণ ফিরিয়ে দিয়েছেন। (অর্থাৎ প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি) যদিও তারা (কাফিররা) তার প্রতি অবিচার করেছিল। তিনি যদি চাইতেন তবে কঠোর হতে পারতেন অথবা প্রতিশোধ নিতে পারতেন। রাসূল (সা.) ক্ষমতাবানদের ঔদ্বত্য ক্ষমা করে দিলেন। আর যখন তিনি অপরাধীদের কর্তৃত্বশীল হলেন তখন তাদেরকে ক্ষমতা করে দিলেন। হে মুহাম্মদ (সা.)! কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। আল্লাহ তায়ালা আপনার উপর নেয়ামত পূর্ণ করে দিয়েছেন যা আপনি জানতেন না। তিনি সেই নেয়ামতের ছায়া প্রসারিত ও সার্বজনীন করে দিয়েছেন। তিনি রাসূলদের ইমামের জন্য যা অঙ্গীকার করেছেন তা পূর্ণ করেছেন। খোদার শপথ, সম্মানিত রাসূলদের সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ হয়ে থাকে।'

ইসলাম ধর্মের কুটুক্তিকারী লর্ড ক্রোমারের বক্তব্যের জবাবে

বৃটিশ উপনিবেশিক শাসক লর্ড ক্রোমার ইসলাম ও মুসলমানদের সর্ম্পকে আপত্তিকর মন্তব্য করে বলেন[১০]-

إن سبب تأخرهم وتخلفهم وانحطاطهم هو اعتناقهم الإسلامية لأنه (أي الإسلام) كما يزعم، دين جهل وخرافة وتواكل.

'মুসলমানদের ব্যর্থতা, পশ্চাদপরাসরণ এবং অধ:পতেরন কারণ হলো ধর্ম হিসেবে ইসলামকে অনুসরণ করা। কেননা তার ধারণামতে ইসলাম অজ্ঞ ও কাল্পনিক ধর্ম।'

মুসলিম কবি সাহিত্যিকরা সাথে সাথে তার প্রতিউত্তর করেন। তবে এক্ষেত্রে আহমাদ মুহাররমের স্বর ছিলো অত্যন্ত তীব্র ও তীক্ষ্ম। তিনি এই খৃষ্টান শয়তানের বক্তব্যের অসারতা কে তুলে ধরে এ দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। তাতে তিনি বলেন, মুসলমানদের পতনের কারণ মূলত ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়া। এক্ষেত্রে ত্রুটি মুসলমানেদর মধ্যে, ইসলামের মধ্যে নয়। তিনি বলেন[১১]

زعمت الدين والقرآن جاءا بما يشقي حياة المسلمينا

زعمت محمدا لم يؤت رشدا ولم يسلك سبيل الصالحينا

رويدك أيها الجبار فينا فبئس الحكم حكم القاسطينا

وهبنا أمة في الجهل غزقي وشعبا في مهانته دفينا

أدين الله يأمرنا بجهل ويوجب أن نذل ونستكينا؟

سل الأحياء والموتى جميعا أكنا أمة مستضعفينا؟

ليالي يبعث الإسلام منا عزائم تخضع المتغطر سينا

نثل عروش جبارين غلبا ونجتث الممالك فاتحينا

তুমি (লর্ড ক্রোমার) আমাদের ব্যাপারে মিথ্যা ধারণা করেছ। ধারণাকারীর বক্তব্য কোন কাজে আসবে না। তুমি মনে করেছ দ্বীন ইসলাম এবং আল-কুরআন মুসলমানদের জীবনে দুঃখ দুর্দশা বয়ে নিয়ে এসেছে। তুমি ধারণা করেছ যে, মুহাম্মদ (সা:) হেদায়েত নিয়ে আগমন করেন নি এবং তিনি নিজেও সৎকর্মশীলদের পথ অনুসরণ করেন নি।

আমাদের মাঝে বিদ্যমান হে অহংকারী শাসক তুমি ধীরে চল। অন্যায়কারীর বিচার কতই না নিকৃষ্ট। আমরা (মুসলমানরা) জাতিকে অজ্ঞতার গহ্বরে ফেলে দিয়েছি। লাঞ্ছনায় প্রথিত করেছি। আল্লাহর দ্বীন কি আমাদেরকে মূর্খ হয়ে থাকতে নির্দেশ দিয়েছে? তুমি (লর্ড ক্রোমার) সকল জড়-জীবকে জিজ্ঞেস কর, আমরা কি দূর্বল জাতি ছিলাম? ইসলাম আমাদের দৃঢ়তাকে পুনর্জীবিত করেছে ফলে উক্ত দৃঢ়তা ঐদ্বত্যপূবর্ণ স্বভাবধারীদের বশীভূত করেছে। পরাভূত করে অহংকারীদের সিংহাসন আমরা ছিনিয়ে নিব এবং বিজয়ীবেশে সম্রাজ্যসমূহ উৎপাটন করব।

ইসলামের উপর অটল থাকার আহবান

কবি স্বীয় সম্প্রদায়কে ঐ সকল বৈশিষ্ট্যের উপর অটল থাকার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন যে গুলো তারা অধিকার করেছিল। সাথে সাথে ইসলামের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা ও লর্ড ক্রোমারের বক্তব্যের জবাবে তিনি **توبوا إلى الهدى** (হেদায়েতের দিকে ফিরে আসো) শিরোনামে একটি কাসীদাও রচনা করেন। যেমন কবি বলেন[১২]-

هل الدين إلا معقل نحتمى به إذا دلف العادي إلينا فأسرعا
هل الدين إلا الروح يحيى نفوسنا حياة ترينا ما حل العيش ممرعا
أنعرض عنه لا مبالين دزءه وآلامه مهما اشتكى وتوجعا
هو الدين أن يذهب فلا عز بعده وإن جدسا عينا على إثر من سعى

'দীন ইসলাম হলো আশ্রয়স্থল, যখন শত্রু আমাদের দিকে ধীর কদমে কিংবা দ্রুতবেগে ধেয়ে আসে তখন এর দ্বারা আমরা আত্মরক্ষা করি। দ্বীন হলো আত্মা, যা আমাদের আত্মাকে জাগিয়ে তোলে এবং জীবনের অনুর্বরতাকে উর্বরতায় পরিণত করে।

যদি এই দ্বীন চলে যায় তাহলে আর কোন সম্মান-ই অবশিষ্ট থাকে না; তবে যদি প্রচেষ্টকারীর পদাংক অনুসরণে আমাদের প্রচেষ্টা ঐকান্তিক হয় তাহলেই সম্মান অবশিষ্ট থাকবে। আমরা কি ইসলাম থেকে অমনোযোগী হয়ে ফিরে যাব? তাহলে তো ইসলামের বিপর্যয় ও দুর্যোগ (আমাদেরকে) অভিযোগ করবে এবং কষ্ট দিবে বা ব্যথিত করবে।'

ইসলাম ধর্মের প্রশংসায় কবির বক্তব্য

একই ধারাবাহিকতায় তিনি ইসলামের প্রশংসা ও লর্ড ক্রোমারকে সম্বোধন করেন বলেন[১৩]-

سننا الرشد للغاوين طرا ولو لا الدين لم نك راشدينا
ولولا معشر خذلوه منا لكنا السابقين الأولين
رويدك أيها الجبار فينا فما انصفتنا دنيا ودينا

'আমরা পথভ্রষ্টদের জন্য যাবতীয় হেদায়েতের পথ প্রবর্তন করেছি। যদি দ্বীন না থাকত তাহলে আমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হতাম না। আমাদের কোন জনগোষ্ঠী যদি দ্বীনকে পরিত্যাগ না করত (তাহলে কতই না ভাল

হত)। কেননা আমরা ছিলাম অগ্রগামী বিজয়ী দল। আমাদের মাঝে অবস্থানকারী ও অহঙ্কারী শাসক (লর্ড ক্রোমার) তুমি ধীরে চল। তুমি দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে আমাদের প্রতি ইনসাফ করনি।'

অনুরূপভাবে কবি কবিতায় ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিবিধান করার পাশাপাশি মুহাম্মদ (সা.) এর প্রশংসা ও অন্যান্য দ্বীনি কর্মকান্ড কে উপজীব্য করে কবিতা রচনা করেছেন। যেমন রমযান, ঈদ, মুহাম্মদ (সা.) এর মদীনার পানে হিজরত, তাঁর জন্মদিন ইত্যাদি বিষয়।[১৪] মানবীয় বিবেচনায় তিনি তাঁর যুগের অসংখ্য সমস্যাবলীকেও কবিতায় বিষয়বস্তু হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করেছেন এবং বিভিন্ন প্রকার কাসিদা ও চমৎকার কবিতার মাধ্যমে তার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সত্যনিষ্ট দেশ প্রেমের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মহান। ধর্মীয় আবেগ-উচ্ছ্বাসকে তিনি তাঁর দেশাত্ববোধক উদ্দীপনায় যোগ করেছেন। আর দ্বীন তো মানুষকে কেবল সম্মান, মর্যাদা ও সৌভাগ্যের দিকেই আহ্বান করে থাকে। এ প্রসঙ্গে আহমাদ মুহাররাম যথার্থই বলেছেন-[১৫]

خلق العروبة أن تجد وتدأبا وسجية الإسلام أن يتغلبا

'আরবেত্বর চরিত্র হলো অধ্যাবসায়ী ও আসক্তিপূর্ণ হওয়া এবং ইসলামের প্রকৃতি হলো বিজয়ী হওয়া।'

ইসলামী ঐক্যের প্রতীক তুর্কী খেলাফতের প্রশংসা

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মিশরে গোত্রপ্রীতি এবং জাতিগত বন্ধনের উপর ইসলামী প্রবণতা প্রবলভাবে বিজয় লাভ করেছিল। এ কারণে তুর্কী খেলাফতের কর্তৃত্বে স্বীকৃতি দানের মিশরীয়রা পিছিয়ে ছিল না। এমন কি সে সময় এ ব্যাপারে কবি সাহিত্যিকদের মাঝেও ছিল না কোন মতানৈক্য। কেউ কেউ মুসলমানদের উপর তুর্কী খেলাফতকে সুদৃঢ় করা ও উক্ত খেলাফতের প্রশংসায় কবিতার দিওয়ান রচনা করেছিলেন এবং তাতে দ্বীনের কালেমাকে বুলন্দ করার আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন।[১৬] তারা মনে করেন খেলাফত হলো সমগ্র মুসলিম জাতিকে একত্রকারী। এজন্য তারা সমগ্র মুসলমানদের কে খেলাফতের ছায়াতলে একত্র হওয়ার আহবান জানান, যাতে শত্রুর পক্ষ থেকে মুসলিম ঐক্যে ফাটল না ধরে।[১৭] আহমাদ মুহাররাম তুর্কী খেলাফতের প্রশংসায় বলেন-[১৮]

يا آل عثمان من ترك ومن عرب وأي شعب يساوى الترك والعربا

صونوا الهلال وزيدوا مجده علما لا مجد من بعده أن ضاع أو ذهبا

أبو الخلائف ذو النورين مورثنا ملك الهلال وهذا المجد والحسبا

يا تاج عثمان أن اليوم موعدنا فجدد العهد وألف الحب والرغبا

‘হে উসমানের বংশধর! তুমি আরব হও কিংবা তুর্কী হও (তাতে কিছু যায় আসে না)। তুমি যে গোত্রের-ই হও না কেন আরব তুর্কী তো বরাবর। তোমরা চন্দ্র (খেলাফত) কে রক্ষা কর এবং তার মর্যাদাকে জ্ঞানের ভিত্তিতে বৃদ্ধি কর। কেননা যদি চন্দ্রটি ধ্বংস হয়ে যায় কিংবা চলে যায় (হাত ছাড়া হয়ে যায়) তাহলে কোন সম্মানই অবশিষ্ট থাকবে না। দুই নূরের অধিকারী, খলিফাদের পিতা হযরত উসমান (রা:) হলেন আমাদের পূর্ব পুরুষ। তিনি এই চন্দ্র (খেলাফত), সম্মান ও উচ্চ বংশের অধিকারী ছিলেন। হে উসমানের মুকুট আজ আমাদের অঙ্গীকারের দিন। সুতরাং তুমি অঙ্গীকারকে নবায়ন কর এবং খেলাফতের প্রতি ভালবাসা ও আগ্রহকে উজ্জ্বল কর।’

কবি মনে করেন না যে তুর্কীরা দুর্বল। বরং রাজনৈতিক বিশ্বে নিরর্থকভাবে তুরস্ককে ‘‘রুগ্ন মানুষ’’ الرجل المريض নামে নামকরণ করা হয়েছে। আজ উক্ত মুমূর্ষের সমগ্র শরীরে পচন ঢুকে পড়েছে। যদি আল্লাহ নিজ হাতে তাকে রক্ষা না করেন তাহলে তা ধ্বংস অনিবার্য। কবি বলেন-[১৯]

وليس يزول ملك الترك حتى تزول الأرض أو تهوى السماء

‘আসন খসে পড়া কিংবা পৃথিবী ধ্বংস হওয়া অবধি তুর্কী সাম্রাজ্য বিদ্যমান থাকবে।’

কবি মনে করেন তুর্কীরা এমন এমন জাতি যারা খেলাফতের দায়িত্ব পরিচালনা ও তার যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণে সদ্ব্যবহার করছে। তাদেরকে উক্ত পদ থেকে সরানো দু:সাহসী ব্যাপার। তারা খেলাফত রক্ষার্থে উত্তম কার্যবলীর সদ্ব্যবহার করছে। তবে ইসলামী রাষ্ট্র সম্প্রসারণের জন্য স্বীয় আবাসভূমি থেকে বিজয়ী বেশে বের হওয়াটাই উক্ত খেলাফতের পতনের কারণ। তাদের দুর্বলতা ও বিশৃংখলার কারণে খেলাফত ব্যবস্থাও দুর্বল হয়ে পড়ে। অবশেষে তার পতন ঘটে এবং পাশ্চাত্যের হিংস্র জানোয়ারদের খাবারের লুকমাতে পরিণত হয়।[২০] যেমন কবি সূদীর্ঘকাল উসমানীদের হাতে খেলাফত টিকে থাকায় তাদের প্রশংসা করে বলেন-[২১]

لولا بنو عثمان والسنن شرعوا لما وضع السبيل الأقوم

سطعوا بآفاق الخلافة فانجلى عنها من الحدثان ليل مظلم

فهم ولاة أمورها وكفاتها وهم حماة ثغورها وهم هم

‘যদি উসমানের বংশধররা না থাকত (তাহলে খেলাফত টিকে থাকত না) যারা (খেলাফতের জন্য) আইন প্রণয়ন করেছিল, ফলে অধিকতর সঠিকপথ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তারা খেলাফতের দিগন্ত দ্বারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলো, ফলে অন্ধকার রজনী আলোকিত হয়েছিল। তারা হলো খেলাফতের প্রশাসক, রক্ষক, প্রহরী ও পৃষ্ঠপোষক।’

কবি ইসলামের প্রতিরক্ষা বিধানে তুর্কীদের উত্তম বীরত্ব ও তাদের সাধারণ শক্তিমত্তার কথা কবিতায় তুলে ধরেছেন। যে শক্তিমত্তা তাদেরকে স্বীয় জাতির রক্ষণাবেক্ষণ ও মুসলমানদের খেলাফত পরিচালনায় দায়িত্ব গ্রহণে আরবদের থেকে তাদেরকেই বেশী যোগ্য করেছে। যেমন কবি বলেন-[২২]

ما للخلافة إلا الترك نحرسها الله يحرسهم في آل ياسين

'খেলাফত তো কেবল তুর্কীদের জন্যই, তারাই সেটা পাহারা দিবে। আর ইয়াসীনের বংশধরদের মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে হেফাজত করবেন।'

তিনি ছিলেন আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন একজন মুসলিম কবি। অসংখ্য কবিতা দ্বারা জাতির যুব সমাজকে তাদের পূর্বসুরীদের মান-মর্যাদা ফিরিয়ে আনার প্রতি আহবান করেছেন। ধর্মীয় ক্ষেত্রে মিশরে বৃটিশ শাসক লর্ড ক্রোমার ইসলামের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করলে তিনি কবিতার মাধ্যমে কঠিনভাবে হুমকি দেন। যেমন তিনি বলেন-[২৩]

نثل عروش جبارين غلبا ونجتث الممالك فامحينا

وقائع ترجف الدولات منها ويذكرها القياصر صاغرينا

'আমরা পরাভূতকরে অহংকারীদের সিংহাসন ছিনিয়ে নিব এবং বিজয়ী বেশে সাম্রাজ্যসমূহ উৎপাটন করব। তা হবে এমন ভয়ানক দূর্ঘটনা, যার কারণে রাষ্ট্র সমূহ কেঁপে উঠবে এবং সম্রাটরা উক্ত ঘটনাকে অবনত মস্তকে (যুগ যুগ ধরে) স্মরণ করবে।

ইসলামী সভ্যতা

আহমাদ মুহাররাম ছিলেন ইসলামী সভ্যতার ধারক বাহক। তিনি ব্যক্তি জীবনে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি লালন করতেন বলেন অনুমিত হয়। ''ইসলামী সভ্যতা'' الحضارة الإسلامية নামে তাঁর একটি কাসীদাও আছে। তার অংশ বিশেষ নিম্নরূপ-[২৪]

إن الحضارة دين الله نعرفها **في محكم الذكر، لاظلم ولاشغب**

الناس إهل وإخوان مواسية في كل شيئ فلا رأس ولا ذنب

الحكم لله فردا لا شريك له ألا له الملك والسلطان والغلب

أقام للناس دينا من جلالته تهوى التماثيل عن ركنيه والنصب

قل للملوك: افيقوا من وساوسكم **زالت غواشى العمى، لنشقت الحجب**

فلا الشعوب تسلم الخسف من ضعة ولا الحقوق بأيدى العسف تغتصب

'নিশ্চয় (ইসলামী) সংস্কৃতিই আল্লাহর দ্বীন, যথার্থ উদেশ্যাবলী (আল-কুরআন) তে তুমি তার পরিচয় পাবে। সেই সংস্কৃতিতে নেই কোন অত্যাচার কিংবা গোলযোগ। সকল মানুষ একই পরিবার ভূক্ত ও ভাই ভাই, সকলক্ষেত্রে তাদের অধিকার সমান। সেই সংস্কৃতিতে নেই উঁচু-নীচুর ব্যবধান। কর্তৃত্ব কেবল আল্লারই, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। রাজত্ব, বাদশাহী এবং বিজয় কেবল তার-ই। তিনি নিজ মহিমায় মানুষের জন্য একটি দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার প্রতিনিধি স্থানীয়রা উক্ত দ্বীনের খুঁটি এবং স্তম্ভ হতে চায়। তুমি রাষ্ট্র প্রধানদের বল, তোমরাকি কুমন্ত্রণা থেকে চেতনা ফিরে পেয়েছে? অন্ধত্বের আবরণ বিলীন হচ্ছে এবং পর্দা বিদীর্ণ হয়েছে। ফলে এমন কোন জাতি নেই যাদের উপর দীনতা আরোপ করা হয়েছে, আর না জুলুমের হাত দ্বারা অধিকার সমূহকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে।'

এভাবে আমরা আহমাদ মুহররামকে দেখতে পাই যে, তিনি একদিকে ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে কটুক্তিকারীদের বিরুদ্ধে সমূচিত জবাব দিয়ে তাদেরকে প্রতিহত করেছেন। অপরদিকে মিশরীয় ঘুমন্ত জাতিকে স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে উসমানী খেলাফতের ছায়াতলে একত্র হওয়ার আহবান জানিয়েছেন।

তথ্যসূত্র

১। আহমাদ মুহাররাম, দিওয়ানু মাজদিল ইসলাম, পৃ. ৪৫-৪৭।

২। সীরাত ইবন হিশাম, অনুবাধক: আকরাম ফারুক, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯ইং), চতুর্দশ প্রকাশ, পৃ. ৫৩।

৩। মোখতাসারুস সীরাহ, শেখ মোহাম্মদ ইবন আব্দুল ওয়াহাব নজদী, পৃ. ৬১।

৪। আহমাদ মুহাররাম, দিওয়ানু মাজদিল ইসলাম, পৃ. ৫০

৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-৫১।

৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

৭। মুহাম্মদ ইবন সা'দ ইবন হুসাইন, আল-আদব আল-আরবী ওয়া তারীখুহু (আল-আছর আল-হাদীছ), পৃ. ৯৬-৯৭।

৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

৯। http://www.ai.jazirah.com.sa/aleem//esson-2688.html

১০। মুহাম্মদ ইবন সা'দ ইবনে হুসাইন, আল-আদব আল-হাদীছ তারীখ ওয়া দিরাসাত, পৃ. ২০৬।

১১। প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬।

১২। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭। ও আহমাদ মুহাররাম, দিওয়ানু মাজদিল ইসলাম, পৃ. ১১।

১৩। মুহাম্মদ ইবন সা'দ ইবনে হুসাইন, আল-আদব আল-হাদীছ তারীখ ওয়া দিরাসাত, ১ম খন্ড, (রিয়াদ, দার আব্দুল আযীয আল হুসাইন, সপ্তম সংস্করণ, ১৪১৮হিঃ/১৯৯৭ইং), পৃ. ২০৬।

১৪। মুহাম্মদ ইবন সা'দ ইবন হুসাইন, আল-আদব আল-আরবী ওয়া তারীখুহু (আল-আছর আল-হাদীছ), পৃ. ৬৫।

১৫। ওমর আল দাসুকি, ফি আল-আদাব আল-হাদীস, (লেবানন, বৈরুত: দার আল-ফিকর), ৭ম সংস্করণ, ২য় খন্ড, পৃ. ১৫২।

১৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫।

১৭। ড. মোহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, আহমাদ মুহাররাম : আশ শাইরুল ওতানী আল-ইসলামী ওয়া ইসলাহাতুহু আল-ইজতিমাইয়্যাহ (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আরবী বিভাগ, ১৯৯৮-১৯৯৯), ৪র্থ সংখ্যা।

১৮। আহমাদ মুহাররাম, দিওয়ানু মাজদিল ইসলাম, পৃ. ২০।

১৯। ওমর আল দাসুকি, ফি আল-আদাব আল-হাদীস, পৃ. ১৫৩।

২০। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।

২১। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।

২২। আহমাদ মুহাররাম, দিওয়ানু মাজদিল ইসলাম, পৃ. ৪৩।

২৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

২৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় : ফররুখ আহমদের জীবনী

- ভূমিকা
- জন্ম ও বংশ পরিচয়
- শিক্ষাজীবন
- পারিবারিক জীবন
- কর্মজীবন
- তাঁর স্বভাব-প্রকৃতি
- তাঁর ধর্মীয় জীবন
- পুরস্কার ও সম্মাননা
- ইন্তেকাল

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে যে ক'জন কবি সাহিত্যিক স্বমহিমায় উজ্জ্বল কাব্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন কবি ফররুখ আহমদ তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি বাংলা সাহিত্যের এক মৌলিক প্রতিভাধর কালজয়ী কবি। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর বিচরণ ঘটলেও কবি হিসেবেই তিনি সকলের নিকট পরিচিত। কবি হিসেবে তাঁর বৈশিষ্ট্য সর্বজন স্বীকৃত। কবিতা, গান, সনেট, গীতিকবিতা, গীতিনাট্য, ব্যাঙ্গনাট্য, মহাকাব্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি বিশেষ ভাবাদর্শে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ছিলেন। যে কারণে অনেক বিরুদ্ধবাদী তাঁর সমালোচনা করেছেন। কেউ কেউ তাকে উপক্ষো করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কেউ কখনো তাঁর অসাধারণ কবি প্রতিভাকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করিনি। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময় তাঁর আগমন ঘটলেও চল্লিশের দশকের শুরু থেকে পরবর্তী সাড়ে তিন দশক কাল তিনিই আমাদের জাতীয়জীবনে প্রধান কবি হিসেবে বিচরণ করেছেন। তিনি ছিলেন ইসলামী চেতনার কবি। তাকে মুসলিম রেনেসাঁর কবিও বলা হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিদ্যমান অবধি জনগণের হৃদয়ের গভীরে ও অন্তরের নিভৃত কোণে তিনি সর্বদা জাগ্রত থাকবেন।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

তিনি ১৯১৮ সালের ১০ই জুন পবিত্র রমযান মাসে যশোর জেলার মাগুরা মহাকুমার (বর্তমানে জেলা) মাঝআইল গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ হাতেম আলী ও মাতার নাম রওশন আখতার। তিনি রমযান মাসে জন্ম গ্রহণ করেন বলে তাঁর দাদি তাকে রমযান বলে ডাকতেন। বাবা-মায়ের দেওয়া নাম সৈয়দ ফররুখ আহমদ।[১] কবির নিজের নাম থেকে 'সৈয়দ' শব্দটি বাদ দেন। এই প্রসঙ্গে সৈয়দ আলী আহসান বলেন '' ফররুখ সৈয়দ বংশের ছেলে এবং আমিও তাই। আমি পারিবারিক সূত্রে সৈয়দ উপাধিটি ব্যবহার করি। এতে আমার আনন্দ ও অহমিকা জাগে। সৈয়দ উপাধিটি ধারণ করলে মনে হয় আমি একটি বিরাট চৈতন্যের অংশ বিশেষ। আমাদের পারিবারিক ধারার মধ্যে সূফী মতবাদটি প্রবল ছিল এবং এখনও আছে। ফররুখের পরিবারের মধ্যে বংশ পরম্পরাক্রমে তারা সৈয়দ কিন্তু তাঁর পূর্ব পুরুষ সূফী ধারায় দীক্ষিত ছিল না। তাঁর পিতা বৃটিশ আমলে জাদরেল পুলিশ ইন্সেপেক্টার ছিলেন। বেশ প্রতাপী পুরুষ হিসাবে তার একটা পরিচয় ছিল। ফররুখ কিন্তু এতে গর্ববোধ করত না। তাঁর কাছে সৈয়দ এবং প্রতাপ দুটি ছিলো পরস্পর বিপরীত ধর্মী তাই ফররুখ জীবনে কখনও সৈয়দ উপাধিটি ধারন করেনি। কোলকাতায় থাকতে আমি একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, কেন সে সৈয়দ উপাধিটি ব্যবহার করে না। ফররুখ উত্তরে বলেছিল, যে তাৎপর্য নিয়ে আমি রাসূলের বংশধর হিসাবে দাবী করব সে তাৎপর্যের কোন কিছু আমার মধ্যে নেই। তাছাড়া

আমি উত্তরাধিকার সূত্রে সৈয়দ উপাধিটি পেয়েছি। এটা আমার কর্মলব্ধ নয়। সুতরাং আমি সৈয়দ ব্যবহার করি না।[২]

শিক্ষা জীবন

কবির শিক্ষার হাতেখড়ি হয়েছে মূলত স্বীয় বাসগৃহে। মায়ের মৃত্যুর পর কবির শৈশবকাল কেটেছে প্রধানত তাঁর দাদির কাছে। দাদি ছিলেন জমিদার বাড়ির মেয়ে। তিনি ছিলেন শিক্ষিতা, জ্ঞানী ও দীর্ঘজীবী মহিলা। এ প্রসঙ্গে কবির মেয়ে সাইয়েদা ইয়াসমিন বানুর স্মৃতিচারণ নিম্নরূপ ''কবি শৈশব ও কৈশোরে তাঁর দাদির কাছ থেকে শুনতেন 'তাজকেরাতুল আওয়লিয়া' ও 'কাসাসুল আম্বিয়া' পুঁথির কাহিনী। এভাবে শৈশবে দাদির কোল থেকেই পুঁথির সাথে ফররুখ আহমদের পরিচয় এবং শিক্ষার হাতেখড়ি হয়েছিল।''[৩]

প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা গ্রামের পাঠশালার পাশাপাশি গৃহে আরবি, ফারসি ও কিছুটা ধর্মীয় শিক্ষা লাভের পর কবি কলকাতার মডেল এম.ই. স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুলটি সম্পর্কে কবি-বন্ধু বিখ্যাত চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান যা লিখছেন ''স্কুলটির নামও ছিল 'মডেল এম.ই. স্কুল'; কলকাতায় মডেল স্কুল নামেই ঐ স্কুলটি পরিচিত ছিল। কলকাতায় তালতলা এলাকায় ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন-এ এক বিরাট জমিদার বাড়িতে এ স্কুলটি ছিল।''[৪] কবির শিক্ষা-দিক্ষা সম্পর্কে কবি-সমালোচক ও ফররুখ গবেষক মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ বলেন '' ফররুখ আহমদ কলকাতার তালতলা মডেল স্কুলে ও বালিগঞ্জ হাইস্কুলে এক সময় পড়াশুনা করলেও তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন খুলনা জেলা স্কুল থেকে ১৯৩৭ সালে। তাঁর শিক্ষক ছিলেন কবি গোলাম মোস্তফা, আবুল ফজল ও কবি আবুল হাসেম।[৫] কবি আবুল হোসেনের কাছ থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে মনে হয় ফররুখ আহমদের প্রথম কবিতা ছাপা হয় সম্ভবত খুলনা জেলা স্কুল ম্যাগাজিনে। কবি আবুল হোসেনের লেখনিতে:

> ''জেলা স্কুলের ম্যাগাজিনখানা সম্পদনার তাড়া
> আমার মগজে গজগজ করি দিচ্ছিল, বেশ নাড়া।
> এমন সময় কিশোর বালক চোখ দুটো টানা টান,
> টেবিলের কোণে রেখে গেল তার ক্ষুদ্র কবিতা খানা
> ক্ষুদ্র হলেও পড়ে দেখি, এ কি নতুন ছন্দ দোলা
> দোলাইয়া গেল নিভৃত মনের অনুভূতি চঞ্চলা।
> ভাবলাম মনে কোথা হতে হবে হয় তো পাচার করা
> অনেকেই করে সে শুভ কাজের কয়জন পড়ে ধরা
> এই ভেবে অবশেষে।
> কবিতাটি তার পাঠিয়ে দিলাম প্রেসে।
> এতদিন পরে কানে এল সেই সিন্ধুর গর্জন
> বাহ্‌রী ছুটেছে লক্ষ্য যে তার হেরার রাজতোরণ

.....
.....
গর্বে আমার বুক খানা ওঠে ফুলে
সেই পথিকের প্রথম তোরণ আমিই দিয়াছি খুলে।''[৬]

এই ছেলেটি হল ফররুখ আহমদ। সে সেই বছরেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে খুলনা ছেড়ে চলে গেল।[৭]

১৯৩৯ সালে কবি রিপন কলেজ থেকে আই.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এরপর কলকাতায় 'স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শনে অনার্স নিয়ে বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যয়, চলচ্চিত্রকার ফতেহ লোহানী ছিলেন তাঁর সহপাঠী। এ সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের সময় মন্বন্তর দেখা দেয়। কবি এ সময় দুর্ভিক্ষ নিয়ে 'লাশ' ও অন্যান্য কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন করেন।[৮] ১৯৪০ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ ছেড়ে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বি.এ. ক্লাসে কলকাতা সিটি কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু বামপন্থি আন্দোলনে জড়িত হয়ে পড়ায় কবির পড়াশুনা আর বেশী দুর অগ্রসর হয়নি। অনার্স পরীক্ষাও আর দেওয়া হয়নি। উক্ত একই সনে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিমলীগ সম্মেলনে গৃহীত ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাবে'র প্রক্ষিতে কবির মতাদর্শগত পরিবর্তন ঘটে। কবি তাঁর মুরশিদ আলেমে দ্বীন অধ্যাপক আব্দুল খালেকের সংস্পর্শে আসার কারণে তাঁর দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে বাম রাজনীতি থেকে ক্রমান্বয়ে ইসলামী চিন্তা চেতনার দিকে পুরাপুরি উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন।[৯]

পারিবারিক জীবন

কবির নানার নাম হুরমাতুল্লাহ। তিনি স্বীয় নাতনি কে কবির সঙ্গে বিয়ের বিষয় মনস্থ করেন। সে মতে তিনি ফররুখ আহমদের বড় ভাই সৈয়দ সিদ্দীক আহমদে-কে কোলকাতায় পত্র মারফত জানান যে, ফররুখ একবার এখানে (বাংলাদেশ) আসলে তিনি অনেক সন্তুষ্ট হবেন। তার আসার বিষয় জানালেই তিনি যাতায়াত খরচ পাঠিয়ে দিবেন। লিলিকে একটি সুপাত্রের হাতে দিতে পারলে মনে শান্তি হত। ফররুখ আহমদ তখন কলকাতায় বড় ভাই সিদ্দীক আহমদের ৩৮ দিলখুশা স্ট্রিটে ৬ নম্বর সার্কাস রোডে বসবাস করেন। বাড়িটি তাদের বাবার টাকায় তৈরি হয়েছিল। কবির নানার আগ্রহে ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে আপন খালাতো বোন সৈয়দা তৈয়বা খাতুন লিলির সঙ্গে ফররুখ আহমদের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিয়ের পর কবি তাঁর বড় ভাইয়ের সাথে যাদবপুরে ঐ বাড়িতেই কিছুকাল অবস্থান করেন।[১০] এই বিয়েতে কবি খুশি ছিলেন তা বিয়ে উপলক্ষে লেখা তাঁর 'উপহার' শীর্ষক কবিতা থেকে বুঝা যায়। কবিতাটি সাওগাত পত্রিকায় অগ্রহায়ন ১৩৪৯ সংখ্যায় ছাপা হয়। কবিতাটি নিম্নে উদ্বৃত হলোঃ-

Dhaka University Institutional Repository

উপহার

আমরা দু'জনে ধরার ধুলায় বাঁধব বাসর-ঘর,
রবে চিরদিন এ স্বয়ম্বরে সত্যের স্বাক্ষর,
রবে চিরদিন বিবাহ-লগ্ন
রইবে প্রেমের মধুতে মগ্ন
হাতে হাতে রেখে চলব আমরা অন্তরে অন্তর;
আমরা দু'জনে ধরার ধুলায় বাঁধব বাসর-ঘর।।
যেথা তুমি আছো যেথা আমি আছি, যেখানে এ পরিচয়
সেখানে রবে না কোনদিন আর কোন ভয়, সংশয়।
আমার প্রেমের কপোত-কপোতী
আলোক-পিয়াসী উর্ধ্বের জ্যোতি
রবে চিরদিন আমাদের চোখে মধুময় ভাস্বর,
আমরা দু'জনে ধরার ধুলায় বাঁধব বাসর-ঘর।।
মিলবে প্রভাত, সন্ধ্যা, রজনী বিবাহের উৎসবে,
আমাদের ঘরে নিত্য প্রেমের মিলনোৎসব হবে।
পাড়ি দিয়ে যাবো সাগরে তরণী,
আমাদের মোহে জাগবে ধরণী
অশ্রু শোনিতে ভাসাবো ধরার আশ্রয় বন্দর;
আমরা দু'জনে ধরার ধুলায় বাঁধব বাসর-ঘর।।
নিবিড় বাঁধনে চিরদিন মোরা বাঁধা রবো পাশাপাশি,
দুর্যোগ রাতে, আঘাতে, ব্যথাতে ফোটাবো প্রেমের হাসি,
ফোটাবো উর্ধ্বে কন্টকহীন
রাঙা শতদল নিত্য নবীন,
সামনে দাঁড়ালে প্রলয়-ভাঙ্গন পাব না আমার ডর;
আমরা দু'জনে ধরার ধুলায় বাঁধব বাসর-ঘর।।
শত ভাঙ্গনের মুখে গড়ে যাব মোরা শত বালুচর
মুখোমুখি হয়ে কথা কবে রাতে তারা-ঘেরা অম্বর
অজানা যে পথ রয়েছে বিথারি'
নির্ভয়ে দেব সেই পথ পাড়ি
পথ-প্রান্তরে ফোটা ফুল তুলে ছড়াব ধরণী পর;
আমরা দু'জনে ধরার ধুলায় বাঁধব বাসর-ঘর।।
যেথা তুমি আছ, যেথা আমি আছি, যেথা আছে ভালবাসা-
যেখানে নিত্য প্রেমের শিখায় জাগে জীবন্ত আশা,
সেথা এসে মোরা দাঁড়াব দু'জনে
হাতে হাত রেখে মন রেখে মনে
জাগবো সেখানে প্রাণ-উৎসব বিচিত্র সুন্দর
আমরা দু'জনে ধরার ধুলায় বাঁধব বাসর-ঘর।।[১১]

ফররুখ আহমদ তিন কন্যা ও আট পুত্র সন্তানের জনক ছিলেন। এরা হলো:-

সৈয়দা শামরুখ বানু (মরহুমা), সৈয়দা লালারুখ বানু, সৈয়দ আব্দুল্লাহেল মাহমুদ (মরহুম), সৈয়দ আব্দুল্লাহেল মাসুদ (মরহুম), সৈয়দ মনজুরে এলাহী (মরহুম), সৈয়দা ইয়াসমিন বানু, সৈয়দ মুহম্মদ আখতারুজ্জামান (আহমদ আখতার), সৈয়দ মুহম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান (বাচ্চু), সৈয়দ মুখলিসুর রহমান, সৈয়দ খলিলুর রহমান ও সৈয়দ মুহম্মদ আবদুহু (মরহুম)[১২]

পিতা হিসাবে তিনি ছিলেন দায়িত্বশীল। সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব পালনে তিনি ছিলেন যত্নবান। ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন খুবই আন্তরিক।

কর্মজীবন

ফররুখ আহমদের কর্মজীবন তেমন সুখের ছিল না। বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবন অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু কখনো কোন প্রতিকূল অবস্থার কাছে তিনি মাথানত করেননি। কর্মজীবনে তিনি বড় মাপের কোন চাকুরী পাননি। কলকাতা-জীবনে তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের চাকুরী করেছেন। কিন্তু কোনটাই স্থায়ী হয়নি। ১৯৪৩ সালে কলকাতা আই জি প্রিজন অফিসে প্রথম চাকুরীতে যোগদান করেন। এটা ছিলো কেরানীর চাকুরী। এরপর ১৯৪৪ সালে যোগ দিয়েছিলেন কলকাতার সিভিল সাপ্লায়ার অফিসে। এ সময় কবির 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফররুখ অত্যন্ত পরিচিত হয়ে উঠেন সকল মহলে। ১৯৪৫ সালে মাসিক মোহাম্মাদীর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[১৩] অল্প কিছু দিনের মধ্যে একটি অপ্রীতকর ঘটনার জন্য পত্রিকার মালিক মাওলানা আকরাম খাঁর সাথে তাঁর মনোমালিন্য ঘটে। ফলে তিনি চাকুরী থেকে ইস্তফা দেন। ১৯৪৬ সালে জলপাই গুড়িতে একটি প্রাইভেট ফার্মে অল্প কয়েকদিন চাকুরী করেন।[১৪] ১৯৪৭ সালে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে উপমহাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। এ দেশ বিভাগের অব্যহতি পরেই ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে ফররুখ আহমদ কলকাতা ছেড়ে ঢাকা চলেন আসেন। ঢাকায় এসে প্রথমে তিনি ঢাকা বেতারে অনিয়মিত শিল্পী হিসেবে যোগদান করেন এবং বেতারের প্রয়োজনে আধুনিক, দেশাত্মবোধক, হামদ-নাত প্রভৃতি গান রচনা করেন। পঞ্চাশের দশক থেকে শিক্ষা মূলক অনুষ্ঠান কিশোর মজলিস পরিচালনা শুরু করেন।[১৫] ১৯৫২ সালের এপ্রিল থেকে নিয়মিত স্টাফ আর্টিস্ট বা নিজেস্ব শিল্পী হিসেবে বহাল ছিলেন। যদিও বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর তৎকালীন সরকারের কোপানলে পতিত হয় তাঁকে কিছু দিন চাকুরীতে সাসপেন্ড থাকতে হয়। তথাপি আমত্যু তিনি এই চাকুরীতে বহাল ছিলেন।[১৬]

তাঁর স্বভাব প্রকৃতি

ফররুখ আহমদ লাঞ্ছিত-বঞ্ছিত, দুঃস্থ ও অবহেলিত মানুষের কল্যাণকামী নাম। তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম মৌলিক প্রতিভাধর কবি। সানাউল্লাহ্ নূরী ব্যক্তি ফররুখ সম্পর্ক বলেন-''ব্যক্তি ফররুখ অসাধারণ দৃঢ়চেতা, আত্মপ্রত্যয়ী এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এক স্পষ্ঠভাষী চরিত্রের অধিকারী মানুষ ছিলেন। স্বাধীনতার পর চরম বঞ্চনা এবং দারিদ্র্যের দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য হলেও মুহূর্তের জন্যও কারও কৃপা প্রার্থী হননি তিনি। সাদামাটা আটপৌরে জীবন যাপন করতেন কবি। একটি সাদা পাঞ্জাবি, একটি পায়জামা এবং পকেটে একটি কলম ও টুপি ছিল তাঁর সম্বল। নিজেই তিনি বাজার করতেন, পরিবার পরিজনের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতেন।''[১৭]

কবি আবুল হাশিম ফররুখ সংক্রান্ত এক স্মতিচারণ মূলক নিবন্ধে লিখেছেন ''খুলনা জেলা স্কুলের ম্যাগাজিনের জন্য এর মধ্যে একটা ছেলে এসে একটা লেখা হাতে দিল। ছেলেটাকে দেখতাম ক্লাসের অন্য ছেলেরা যখন মাষ্টার সাহেবদের জব্দ করার জন্য ফন্দি আটতে থাকতো, তখন সে বসে থাকত নির্বাক মুখে; বই মেলে তার ডাগর চোখ দু'টি ঢেকে। লেখাটি পড়ে দেখলাম। চমৎকার লাগল। একটু ঘষামাজ করে সেটা প্রেসে পাঠিয়ে দিলাম। এই ছেলেটি হ'ল ফররুখ আহমদ।[১৮] তিনি নিজের প্রশংসা শোনা একদম পছন্দ করতেন না। একবার রাজশাহীর এক ছেলে তাঁর 'সাত সাগরের মাঝি' পড়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে আসলে তিনি রাগে ফুঁসে উঠলেন এবং বললেন-''আমি এ-সব শস্তা প্রশংসা শোনা পছন্দ করি না। আমি এ ধরনের প্রশংসার জন্য কলম ধরিনি। আমি লিখেছি আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য। কোন মানুষের শ্রদ্ধা ভালোবাস পাওয়া তো আমার কাম্য নয়। আমায় কত প্রতিষ্ঠান থেকে সম্বর্ধনা দেবার জন্য প্রস্তাব করেছে, আমি তাতে সম্মত হইনি। যারা সম্বর্ধনা গ্রহণ করে, তারা প্রকারন্তরে ফেরাউনের দলে মিশে যায়।''[১৯] আভিজাত্যের মোহ তাঁর ছিল না। তিনি অল্পতেই তুষ্ঠ হতে পারতেন। হাতে টাকা পয়সা আসলে কবি কিছুটা বেহিসাবী হয়ে উঠতেন। রুই, কাতলা, চিংড়ি, হালুয়া, পানির, ফজলী আম, কাবাব, আনারস তাঁর পছন্দের খাবার ছিল। সুযোগ পেলেই এসব খাবার তিনি কিনে আনতেন।[২০] তিনি রোমান্টিক ছিলেন। লম্বা পাঞ্জাবী ও ধুতি পরিধান করতেন। উল্টয়ে আঁচড়ানো বড় বড় চুল কিছুটা এলো-মেলোই থাকত। যৌবনে পাতলা ছিপছিপে গঠন, গায়ের রং ফর্সা ছিল। কবি ফররুখের চরিত্রের সবচেয়ে বড় গুণ যেটা ছিল সেটা হ'ল সত্যকে তিনি নির্ভয়ে প্রকাশ করতেন। ফররুখ আহমদ বলতেন ''আমাকে অনেকেই গোঁড়া মনে করে, কিন্তু জানো আমার বিছানার এক পাশে রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' থাকে এবং অন্যপাশে থাকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ কাব্য'।[২১] সৈয়দ আলী আহসান বলেন ''ফররুখের একটি অভ্যাস ছিল মানুষের নানা রকম নামকরণ করা। এ ব্যাপারে তাঁর দক্ষতা ছিল অপরিসীম।''[২২] তার কর্ম ও বিশ্বাসে কোন বৈপরীত্য ছিল না। তাঁর লেখায় তাঁর

বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছিল। জীবিতকালে মতাদর্শের কারণে অনেকেই তাঁর সমর্থন না করলেও তাঁরাও একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, ফররুখ ছিলেন আপোষহীন ও মানুষের দুঃখ দুর্দশার প্রতি বিগলিত প্রাণ।[২৩]

পরিশেষে বলতে পারি, ফররুখ আহমদ হারিয়ে যাবার মত ব্যক্তি নন। তিনি কখনও হারাবেন না, হারিয়ে যাবেন না। তিনি তাঁর কবি পরিচয়ে বেঁচে থাকবেন এবং চিরকাল উজ্জ্বলভাবে বেঁচে থাকবেন।

তাঁর ধর্মীয় জীবন

ধর্মের ব্যাপারে তিনি ছিলেন আপোষহীন। তিনি নিজে ধর্মীয় বিধি-বিধান যেমন মেনে চলতেন পরিবারের অন্যদেরকেও সে দিকে অনুপ্রাণিত করতেন। তাঁর নীতি-আদর্শ সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ কবির বক্তব্য কোড করেন ''ইসলামের রীতিনীতিকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যদি কোন কিছু করা যায় তাহলে তা করবো, নাহলে উপোস করে মরে যেতে প্রস্তুত আছি তবুও কোন গায়রে ইসলামী কাজ করবো না, এই ছিলো ফররুখ আহমদের জীবন-নীতি। তাঁর জীবনের দ্বিতীয় নীতি ছিল, একমাত্র আল্লাহর কাছেই হাত পাতবো এ দুনিয়ার কোন মানুষের কাছে হাত পাততে পারি না, অপরের কাছে কোন সাহায্যও চাইতে পারি না। আমার মাথা একমাত্র আল্লাহর কাছে নত করতে পারি।''[২৪]

কবি কন্যা সাইয়েদা ইয়াসমিন বানু লিখেছেন-''আব্বা বলতেন, 'দাম্ভিক পরহেজগারের চাইতে অনুতপ্ত পাপী ভালো'। ব্যক্তি জীবনে আব্বা ছিলেন পরহেজগার। জীবনে জ্ঞান থাকা অবস্থায় স্বেচ্ছাকৃতভাবে সাধারণত নামাজ কাজা করেননি তিনি। শরীর ভীষন অসুস্থ থাকা অবস্থায় ত্রিশ রোজাই রেখেছেন। আব্বা ধার্মিক ছিলেন কিন্তু গোঁড়া ছিলেন না; সাম্প্রদায়িক তো ছিলেনই না। নবীজীর সুন্নতকে ভালবাসতেন বলে আব্বা কাপড় তালি দিয়ে পরতেন। দরিদ্রদের আব্বা অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি ছিলেন রাসূল (সা.) এর সুন্নাতের একান্ত অনুসারী, তাই রসুলেরই মত দরিদ্ররা ছিল আব্বার প্রিয়পত্র। মহানবী (সা.) শ্রমের মর্যাদার যে শিক্ষা দিয়েছেন, আব্বা তাঁর জীবনে সেটা পুরাপুরী বাস্তবায়িত করেছেন। সোনার চামচ মুখে নিয়েই আব্বার জন্ম হয়েছিলো, কিন্তু দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়েছে। দারিদ্র্য তাঁর মাথা নত করতে পারেনি। দারিদ্র্য তাঁকে সম্মান দান করেছে। এই মর্দে মুমিন জীবনে আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে মাথা নত করেননি। শির উঁচু রেখে সম্মানের সংগে এই জরাগ্রস্থ পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিয়েছেন''।[২৫] এটাই ছিল কবি ফররুখ আহমদের বাস্তব জীবন চিত্র। এরূপ আপোষহীন, ধার্মিক, আদর্শবাদী কবি-চরিত্র আমাদের সমাজে একান্ত দুর্লভ।

পুরষ্কার ও সম্মাননা

ফররুখ আহমদ তাঁর সাহিত্যকীর্তির জন্য নিম্নোক্ত পুরষ্কার ও সম্মাননা লাভ করেন:-

প্রেসিডেন্ট পুরষ্কার প্রাইড অব পারফরমেন্স-১৯৬০

বাংলা একাডেমী পুরষ্কার-১৯৬০

'হাতেম তা'য়ী গ্রন্থের জন্য আদমজী পুরষ্কার-১৯৬৬

'পাখীর বাসা'' গ্রন্থের জন্য ইউনেস্কো পুরষ্কার লাভ করেন-১৯৬৬।[২৬]

একুশে পদক-১৯৭৭

স্বাধীনতা পুরষ্কার-১৯৭৮

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরষ্কার-১৯৭৯

ভাষা-সৈনিক সংবর্ধনা ও পুরষ্কার-১৯৮৩।[২৭]

ইন্তেকাল

১৯৭৪ সালে ১৯ অক্টোবর, শনিবার সন্ধ্যাবেলা (রমযান মাসে) ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। শাহজাহানপুরে কবি বেনজীর আহমদের বাসস্থান ও মসজিদ সংলগ্ন আম বাগানে মরহুমের লাশ দাফন করা হয়।[২৮]

তথ্যসূত্র

১. অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, ফররুখ আহমদের সাত সাগরের মাঝি, (ঢাকা: এস আর প্রকাশন, ২০১৫), প্রথম প্রকাশ, পৃ.৭৪।

২. মুহাম্মদ মতিউর রহমান-সম্পাদিত ফররুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য, (ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০১৫), ১ম খন্ড, পৃ. ৫৪-৫৫।

৩. সাইয়েদা ইয়াসমিন বানু: আব্বাকে যেমন দেখেছি, ঢাকা ডাইজেস্ট, নভেম্বর ১৯৭৪।

৪. অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান: ফররুখ প্রতিভা, (ঢাকা: ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন ও কথাশিল্প প্রকাশন, ২০১৭), ৩য় প্রকাশ, পৃ. ২২।

৫. প্রাগুক্ত পৃ.২২।

৬. সাইয়েদা ইয়াসমিন বানু: আব্বাকে যেমন দেখেছি, ঢাকা ডাইজেস্ট।

৭. মুহাম্মদ মতিউর রহমান-সম্পাদিত ফররুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য, (ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ৩৮/৪, মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, জুন ২০১৫, ১ম খন্ড, পৃ. ২১।

৮. মুহাম্মদ মতিউর রহমান-সম্পাদিত ফররুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য, পৃ. ২৯৩।

৯. মুহাম্মদ মতিউর রহমান-সম্পাদিত ফররুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য, পৃ. ৬২৫।

১০. অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, ফররুখ প্রতিভা, পৃ. ৫-২৬।

১১. প্রাগুক্ত পৃ. ২৭-২৮।

১২. প্রাগুক্ত পৃ. ২৯।

১৩. অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান: ফররুখ প্রতিভা, পৃ. ৩১।

১৪. মুহাম্মদ মতিউর রহমান-সম্পাদিত ফররুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য, পৃ. ৬২।

১৫. প্রাগুক্ত পৃ.৬৬২।

১৬. ফররুখ আহমদ (সংকলন), (ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুকস সোসাইটি লিঃ, ২০১৬), ২য় প্রকাশ, পৃ. ২১৫।

১৭. সানাউল্লাহ নূরী, ব্যক্তি ও কাব্য-শিল্পী ফররুখ, ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, জুন ২০০১।

১৮. আবুল হাশেম, আমার ছাত্র ফররুখ, ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, একাদশ সংখ্যা, জুন ২০০৫।

১৯. মুহাম্মদ মতিউর রহমান-সম্পাদিত ফররুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য, পৃ. ২৯।

২০. অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান: ফররুখ প্রতিভা, পৃ.২৯।

২১. মুহাম্মদ মতিউর রহমান-সম্পাদিত ফররুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য, পৃ.৩৪-৩৭।

২২. প্রাগুক্ত পৃ.২৯।

২৩. আব্দুর রশীদ খান, দুঃসময়ের দিশারী : কবি ফররুখ আহমদ, ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ত্রয়োদশ সংখ্যা জুন ২০০৬।

২৪. মুহাম্মদ মতিউর রহমান-সম্পাদিত ফররুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য, পৃ.২৯।

২৫. 'আব্বাকে যেমন দেখেছি', শাহাবুদ্দীন আহমদ-সম্পাদিত 'ফররুখ আহমদ: ব্যক্তি ও কবি', ১৯৮৪, প্রথম সংস্করণ পৃ. ২৮৩-২৮৫।

২৬. ফররুখ আহমদ (সংকলন), পৃ. ২১৫।

২৭. অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান: ফররুখ আহমদের সাত সাগরের মাঝি, পৃ. ৮০।

২৮. মুহাম্মদ মতিউর রহমান-সম্পাদিত ফররুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য, পৃ. ৬২৮।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় : ফররুখ আহমদের কবিতার বিষয়বস্তু ও ইসলামী ভাবধারার নানাদিক

প্রথম পরিচ্ছেদ : ফররুখ আহমদের কবিতার বিষয়বস্তু

- ভূমিকা
- ইসলামী জাগরণমূলক কবিতা
- ইতিহাস বর্ণনামূলক কবিতা
- বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশ
- মানবতাবাদী আদর্শের রূপায়ন
- মুসলিম ঐহিত্যের বর্ণনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ফররুখ আহমদের কবিতায় ইসলামী ভাবধারার নানাদিক

- মহানবী (সা.) এর পৃথিবীতে আগমন
- ইসলামী ঐতিহ্য ও আদর্শ বোধে উদ্বুদ্ধ করণের আহবান
- খোলাফায়ে রাশেদীনের স্তুতি
- কারবালার বিষাদময় ঘটনার বিবরণ
- মহানবী মুহাম্মদ (সা.) এর প্রশংসা বর্ণনা
- মুসলিম মুনষিদের জীবনকথার বর্ণনা
- রমজান মাসের ফযীলত ও করণীয় প্রসঙ্গে
- হক ও বাতিলের পার্থক্য বর্ণনায় কবির কবিতা
- কাব্যে কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের মর্মবাণী
- আল কোরআনের কাব্যানুবাদ
- ইসলামী সঙ্গীত বা মোনাজাত
- উপসংহার

ভুমিকা

ফররুখ আহমদ বাংলা কাব্যের অন্যতম প্রধান মৌলিক প্রতিভাধর কবি। অনেকে তাঁকে শুধু ইসলামী আদর্শ-ঐতিহ্যের কবি হিসাবে জানেন। এটা তাঁর কবি স্বভাবের মূল পরিচয় এবং তাঁকে সহজে চিহ্নিত করার একটি উপায়। ইসলামী আদর্শ, ভাব, ইতিহাস ও চিন্তা-চেতনা ফররুখ আহমদের কবি-কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তিনি বাংলা কাব্যে মুসলিম জাতিকে এক বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি তাঁর কবিতার মাধ্যমে ইসলামী পুনর্জাগরনের স্পৃহা জাগ্রত করেছেন এবং তাঁর কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য-চেতনা বিবৃত হয়েছে। এই জন্য তাঁকে ইসলামী রেনেসাঁ ও মুসলিম ঐতিহ্যের কবি হিসেবে অভিত করা হয়। নিম্নে তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু ও ইসলামী ভাবধারার বিভিন্ন দিক তুলে ধলা হলো:

ফররুখ আহমদের কবিতার বিষয়বস্তু

ইসলামী জাগরণমূলক কবিতা:

ইসলামী রেনেসাঁর কবি হিসেবে খ্যাত ফররুখ তাঁর কাব্য-কবিতায় সরাসরি ইসলামের কথা উচ্চারণ করেননি। প্রতীক ও রূপকল্পের মাধ্যমে তিনি তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাব্য-ভাষায়, অসাধারণ কাব্য-কুশলতায় যে বলিষ্ঠ ভাব ও আবেদন, ফুটিয়ে তুলেছেন, তা ইসলামের ব্যঞ্জনাকেই প্রমূর্ত করে তোলে। যেমন কবি বলেন:[১]

''কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ,
পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ ব'য়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক;
নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দাবাদ''

কবি তাঁর সাত সাগরের মাঝি কাব্যগ্রন্থে প্রতীকের আশ্রয় নিয়ে ইসলাম ও মুসলিম পুনর্জাগরণের কথায় বলেছেন। মুসলিম রেনের্সা ও মানবতাবাদের নবজাগরণই তাঁর লক্ষ্য। তিনি কবিতার মাধ্যমে বলেনে:

''এখানে এখন রাত্রি এসেছে নেমে,
তবু দেখা যায় দূরে বহুদূরে হেরার রাজ-তোরণ
এখানে এখন প্রবল ক্ষুধায় মানুষ উঠছে কেঁপে,
এখানে এখন অজস্র ধারা উঠছে দু'চোখ ছেপে
তবু দেখা যায় দূরে বহুদূরে হেরার রাজ-তোরণ...''[২]

ইতিহাস বর্ণনা মূলক কবিতা :

উপমহাদেশে ইসলামের বিকৃতি ও মুসলমানদের সর্বনাশের মূলে মোগল সম্রাট আকবরের অবদান সর্বাধিক। তিনি 'দীনে এলাহী' নামে এক নতুন ধর্ম প্রবর্তন করে ইসলামের বিকৃতি সাধানের অপ্রয়াসে লিপ্ত হন। হিন্দু ও রাজপুত রমণীদের পাণি গ্রহণ করে তিনি মোগল পরিবারে নতুন সংস্কৃতি আমদানি করেন। হিন্দু ও রাজপুত রমণীগণ তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করেনি, বরং তারা রাজ-পরিবারে পূজা-অর্চনা তথা পৌত্তলিকতার অনুপ্রবেশ ঘটান। রাজা-পরিবারে ইসলামী আদর্শ ও সংস্কৃতির বদলে পৌত্তলিক আদর্শ ও সংস্কৃতি প্রবেশ ঘটে। ফলে উপমহাদেশের মুসরিম সমাজেও তার প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। কবি এর বর্ণনা দিয়েছেন ভোবে:

''বিজাতীয় রমণীর রঙ্গরস হৃদয়ে, মগজে
বিজাতীয় ভাবধারা দিয়েছিল অত্যন্ত সহজে,
বিশেষ রিপুর চক্রে স্থান-ভ্রষ্ট পৌরুষের শিলা
চেয়েছিল রাত্রি দিন অনির্বাণ বৃন্দাবনলীলা,
এবং তা পেয়েছিল সুপ্রচুর স্বর্ণ বিনিময়ে।
মিশ্রণ কাহিনী সেই ভাবি আমি নির্বাক বিস্ময়ে।''

''মুক্তপক্ষ শাহবাজ সে নেশায় চড়ুই যেমন
তৌহিদী কালাম ভুলে গেয়েছিল কীর্তন, ভজন।
'কৃষ্টি সমন্বয়ে' ফের জন্মেছিল যে রুগ্ন সন্তান
স্বভাবত ছিল তার কাশী কিংবা কিষ্কিন্ধার টান,
মক্কা মদীনার কথা যে কারণে হ'ল তার ভুল;
বিজাতীয় পরিবেশে পেয়েছিল প্রাধান্য মাতুল।''[৩]

বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশ :

বাংলাদেশের নদী-নিসর্গ ফররুখ আহমদের কবিতায় বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। 'সাত সাগরের মাঝি'র কবি এ দেশের বহু নদীকে আশ্রয় করে নানা আঙ্গিকের কবিতা লিখেছেন। চল্লিশের দশকে অর্থাৎ তাঁর কবি-জীবনের প্রাথমিক পর্বে রচিত 'মধুমতী তীরে' শীর্ষক কবিতার অংশবিশেষের উদ্ধৃতি দেওয়া হলো:

''আকাশের মাঠ ঘিরে ঘিরে ঘন সূর্যাস্তের নলবনে
তারি মাঝে ডুব দিয়ে পাখী চাঁদ দেখে আলোর স্বপন,
দিনের কুশ্রীতা ঝেড়ে ফেলে ওড়ে কোন শুভ্র রাজহাঁস
জোছনা ভেজানো তনু তার নীচে ফেলে মাঠ মরা ঘাস
উড়ে চলে আকাশের ধারে অন্তহীন নদীর কিনারে।
জনতার কোলাহল নাই প্রশান্তির স্বপ্ন-মধুমতী
দুই পাশে ধান ক্ষেত রেখে অবিশ্রান্ত চলে সেই নদী''

আউশ ও আমন ধানের ও আমন ধানের ফলনে কৃষাণ পল্লীতে ও চাষা পরিবারের জীবনে যে আনন্দধারা প্রবাহিত হয়, নবান্নের উৎসবও হয়ে থাকে, তাও বিধৃত হয়েছে কবিতায়:

''আউশ ধানের স্বপ্নে কৃষাণের তপ্ত দিন কাটে;
আমনের বন্যা আনে ফসলের সম্পূর্ণ জোয়ার।
শোকর-গোজীরা ক'রে তারপর দরবারে খোদার
গোলায় তোলে সে ধান-
কৃষাণ-পল্লীতে আনে পরিপূর্ণ সুরের সম্ভার।''[৪]

মানবতাবাধী আদর্শের রূপায়ন :

মানবতাবাদী কবি ফররুখ আহমদের অজস্র রচনায়-বিশেষত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন এবং ১৩৫০ সালের মহামন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত বহু কবিতায় দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, অনাহার-ক্লিষ্ট মৃত মানুষের করুণ ও মর্মন্তুদ পরিণতির চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। শুধু ১৩৫০-এর মন্বন্তরের পটভূমিতে লেখা তাঁর সুবিখ্যাত 'লাশ' কবিতায় নয়, তার আগে রচিত বহু কবিতায়ও ফররুখ আহমদের মানবতাবাদী মনের উজ্জ্বল পরিচয় রূপ পেয়েছে। জড় সভ্যতা ও স্ফীতমেদ শোষক সমাজের বিরুদ্ধে তিনি উচ্চারণ করেছেন ঘৃণা ও ধিক্কার। মানবতার বিজয়ে আশাবাদী ও বিশ্বাসী কবি জানেন, একদিন এই নিপীড়িত মানুষের অভ্যুত্থান ঘটবে-আগামী কোন ভবিষ্যতে। জড়সভ্যতার দাস স্ফীতমেদ শোষক সমাজ সেদিন হবে মৃত্যু-মুখী। ফররুখ আহমদ বলেন:

''হে জড় সভ্যতা!
মৃত-সভ্যতার দাস স্ফীতমেদ শোষক-সমাজ।
মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ;

তারপর আসিলে সময়

বিশ্বময়

তোমার শৃংখলগত মাংসপিন্ডে পদাঘাত হানি'

নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বার-প্রান্তে টানি';

আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যুদীর্ণ নিখিলের অভিশাপ বও;

ধ্বংস হও

তুমি ধ্বংস হও।।"[৫]

মুসলিম ঐতিহ্যের বর্ণনা :

কবি ফররুখ আহমদ বাংলা কাব্যে মুসলিম জাতিকে এক বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন। অলস জড়তার বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী জেহাদী ভূমিকা পালনে অবর্তীর্ণ হয়। তিনি অন্যায়, শোষণ, লাঞ্ছনা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানান:

''হাজার দ্বীপের বদ রুসমের উপরে লানত হানি

কিশ্‌তির মুখ ফিরায়েছি মোরা টানি।

নিজেকে আজ

জয় করে নিতে চালাও সাহসী কুচকাওয়াজ

মনের সকল দিগন্তে করো সমর সাজ

মাটির আকাশে মনের আকাশে গর্জে বাজ।"[৬]

কবি ফররুখ আহমদ আমাদের ঐতিহ্যিক জীবনের পথ দেখিয়েছেন। তিনি সবল জাগরণী বাণী শুনিয়েছেন। তাওহীদের পথে, পারত্রিক জীবনের অনুশীলনীতে, অধ্যাত্ম্য সাধনায় উৎসাহিত করেছেন। ফলে তাঁর কাব্যের বহু স্থানে তাসাওফের শিখা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে। তিনি 'সিরাজাম মুনীরা', শীর্ষক কবিতায় মহানবী (সা.)-এর পথ ধরে যুগে যুগে যারা এগিয়ে চলেছেন, তাঁদের বিবরণ দিয়েছেন এভাবে:

''চলেছে ধ্যাণের জ্ঞান-শিখা বয়ে জিলানী বীর, চিশতী বীর

রঙিন করি মারি সূরাহী নক্‌শ্বন্দের নয়ন নীর,

জ্ঞানের প্রেমের নিশান তুলেছে হাজার সালামের মুজাদ্দিস

রায় বেরেলীর জঙ্গী দিলীর ভেঙেছে লক্ষ রাতের নিঁদ

ওরা গেছে বহি তোমার নিশান রেখে গেছে পথে সেই নিশানি।
তবু সে চলার শেষ নাই আর, কোনদিন শেষ হবে না জানি।
লাখো সামাদান জ্বলে অফুরান রাত্রি তোমার রশ্মি স্বরি
সে আলো বিভায় মুখ তুলে চায় প্রাণ পিপাসায় এ শর্বরী।"[৭]

পরিশেষে আমি বলব ফররুখ আহমদের কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ন কাব্যমূল্যের মর্যাদায় উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রতিভার যে বিশিষ্ট চেতনা ও প্রক্রিয়ায় বাংলা কাব্যে ও অভিনব শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে, তার মর্মবাণী সর্বদাই আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ।

তথ্যসূত্র

১। ফররুখ আহমদ, *সাত সাগরের মাঝি*, পৃ. ৯।

২। ফররুখ আহমদ, *সাত সাগরের মাঝি*, পৃ. ৬১।

৩। ফররুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য: মুহাম্মদ মতিউর রহমান-সম্পাদিত, পৃ. ৩৫৭।

৪। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, ফররুখ-কাব্যে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশ, (ঢাকা: ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ২০০৪), দশম সংখ্যা।

৫। ফররুখ আহমদ, *সাত সাগরের মাঝি*, পৃ. ৪৩।

৬। ফররুখ আহমদ, *সাত সাগরের মাঝি*, পৃ. ১০ ও ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ, ফররুখ আহমদের কাব্যে মুসলিম ঐহিত্য, (ঢাকা: ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ২০০০) ২য় সংখ্যা।

৭। প্রাগুপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

ফররুখ আহমদের কবিতায় ইসলামী ভাবধারার নানাদিক

(ক) মহানবী (সা.) এর পৃথিবীতে আগমন

পৃথিবী যখন পাপ ও অজ্ঞানতায় অন্ধকারে নিমজ্জিত, মহানবী (সা.) তখন পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন চিরন্তন সত্যের আলোক-বর্তিকা হিসাবে। কবি এখানে মহানবীর (সা.) আবির্ভাবকে প্রতীকের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন:-

''পূর্বাচলের দিগন্তনীল সে জাগে শাহানশাহের মত
তার স্বাক্ষর বাতাসের আগে ওড়ে নীলাভ্যে অনবরত।
ঘুম ভাঙলো কি হে আলোর পাখী? মহানীলিমার ভ্রাম্যমান
রাত্রি-স্তব্ধ কণ্ঠ হতে কি ঝ'রবে এবার দিনের গান?''[১]

প্রভাত সূর্যের কিরণমালা যেমন পূর্ব থেকে ধীরে ধীরে দশ দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে; মহানবী (সা.) এই পৃথিবীতে আগমনে তেমিন জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত এই ধরনী হেদায়েতের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বাতিল শক্তির ভীত প্রকাম্পিত হয়। সমস্ত বিশ্ব-চরাচরে এ মহামানবের আগমনে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। কবি গভীর আবেগ ও আনন্দ-মুগ্ধ চিত্তে এ ঐতিহাসিক মুহূর্তের বর্ণনা দিয়েছেন। কবি বলেন:

''কে আসে, কে আসে সাড়া প'ড়ে যায়
কে আসে, কে আসে নতুন সাড়া।
জাগে সুষপ্ত মৃত জনপদ জাগে শতাব্দী ঘুমের পাড়া।
হারা সম্বিত ফিরে দিতে বুকে তুমি আনো প্রিয় আবহায়াত,
জানি সিরাজাম-মুনীরা তোমার রশ্মিতে জাগে কোটি প্রভাত,
তব বিদ্যুৎকনা-স্ফলিঙ্গে লুকানো র'য়েছে লক্ষ দিন,
তোমার আলোয় জাগে সিদ্দিক, জিন্নুরাইন, আলী নবীন,
ঘুম ভেঙে যায় আর-ফারুকের-হেরিও প্রভাত জ্যেতিস্মান
মুক্তি উদার আলোক তোমার অগনন শিখা পার যে প্রাণ।''[২]

(খ) ইসলামী ঐতিহ্য ও আদর্শবোধে উদ্বুদ্ধ করণের আহবান

মুসলমানদের অতীত ইতিহাস গৌরবোজ্জল। কিন্ত ভারতীয় মুসলমানরা ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষনে নিপীড়িত হওয়ার ফলে তারা তাদের ঐতিহ্যের কথা একেবারেই ভূলে যায়। নিমজ্জিত হয়ে পড়ে খেল

তামাসা ও আয়েশী জীবনে। বিশ্বের সর্বত্র যখন প্রগতি জয়যাত্রা শুরু হয়েছে মুসলমানরা তখন অতীতমুখী হয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। তাদের ধিককার দিয়ে কবির পক্ষ থেকে ডাক এল:

''কত যে আধার পর্দা পারায়ে ভোর হ'ল জানিনা তা।
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।
দুয়ারে তোমার সাত-সাগরের জোয়ার এনছে ফেনা।
তবু জাগলে না? তবু তুমি জাগলে না?
সাত-সাগরের মাঝি চেয়ে দেখ দুয়ারে ডাক জাহান,
অচল ছবি সে তসবির যেন দাঁড়ায়ে রয়েছে আজ।
হালে পানি নাই, পাল তার ওড়ে নাকো,
হে নাবিক! তুমি মিনতি আমার রাখো:
তুমি উঠে এসো, তুমি উঠে এসো মাঝি মাল্লার দলে
দেখাব তোমরার কিশতী আবার ভেসেছে সাগর জলে,
নীল দরিয়ায় যেন সে পূর্ণ চাঁদ,
মেঘ-রতঙ্গ কেটে কেটে চলে ভেঙে চলে সব বাঁধ।
তবে তুমি জাগো, কখন সকালে ঝরেছে হাসনাহেনা
এখনো তোমার ঘুম ভালো না? তবু তুমি জাগলে না?[৩]

মুসলমানদের অতীত জীবন ছিল গৌরবময়। দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে এক সাগর হতে অন্য সাগরে কিশতি জাগিয়ে ফিরত তারা। কারো বাধা তারা মানত না। কিন্তু আজ? মুসলমানদের প্রাণের সেই প্রবল স্রোত থেমে গেছে। হতাশা আর অবসাদে তারা মৃতের মত পড়ে আছে। কবি সিন্দাবাদকে দুর্বার, দুঃসাহসী মুসলমানদের প্রতীকী রুপে গ্রহণ করে এ জড়তা ভেঙ্গে ফেলার জন্য আহ্বান জানিয়ে বলেন:

''ভেঙ্গে ফেলো আজ খাকের মমতা আকাশে উঠেছে চাঁদ,
দরিয়ার বুকে দামাল জোয়ার ভাঙছে বালুর বাঁধ,
ছিঁড়ে ফেলে আজ আয়েশী রাতের মখমল-অবসাদ,
নতুন পানিতে হাল খুলে দাও, হে মাঝি সিন্দাবাদ।[৪]

এক সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দিক্ষায় মুসলমানরা ছিল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় উড়াতো তাদের বিজয় পতাকা। সাগর থেকে মহাসাগরে চলত তাদের দুঃসাহসিক অভিযাত্রা। আজ তারা অন্য জাতির গোলামে পরিণত হয়েছে। কবি মনে করেন যে আদর্শ আরবের মরুচারী, বর্বর সমাজে এক

সর্বাত্মক বিপ্লব নিয়ে এসেছিল, তাদের জীবনকে সবদিক দিয়ে সাফল্য ও প্রাচুর্য পরিপূর্ণ করে তুলেছিল তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে মুসলমানরা আজও চরম সাফল্যের দ্বার প্রান্তে উপনীত হতে পারে। কবি সিন্দাবাদ কবিতায় সিন্দাবাদকে মুসলমানদের প্রতীকী কল্পনা করে তাদেরকে আত্ম-শান্তিতে বলীয়ান ও নবজাগরণের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।[৫] কবি সিন্দাবাদের মতই দুর্দমনীয় হয়ে নতুন পানিতে নতুন জীবনের অভিযাত্রায় মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন:

কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,
শুনেছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
ভাসে জোর ওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ,
পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ ব'য়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক;
নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দাবাদ।[৬]

আববের বুকে যখন ইসলামের সাম্য, শান্তি ও সত্যবাণী প্রচারিত হয় তা অনুসরণ করে মুসলমানরা কেবল নিজেদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করে নাই তারা বিশ্বে সর্বত্র সে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে উপনীত হয়েছে। সে গৌরবের দিন আর নেই, কিন্তু কবির প্রত্যাশা হলো মুসলিম জাতি আবার নতুন ভাবে জীবনের জয়যাত্রা শুরু করবে। তাই কবি বলেন:

'জড়ো করি লাল, পোখরাজ আর ইয়াকুত ভরা দিন
দরিয়ার বুকে নামায়েছি ফের বে-দেরেগ সংগিন
সমুদ্র-সিনা ফেড়ে ছিড়ে চলে কিশতী, স্বপ্ন সাধ;
নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দাবাদ।'[৭]

রাতের আঁধারে সাগরের বুকে জাহাজের যাত্রীরা যেমন প্রভাতের আলোর অপেক্ষায় প্রতীক্ষামান থাকে তেমনি অধ:পতিত মুসলিম জাতীয় জীবনে তিমির রজনীর অবসান হয়ে কবে আলোকোজ্জ্বল দিনের আবির্ভাব হবে কবি তারই প্রতীক্ষায় আধীর প্রহর গুণছেন। কবির বিখ্যাত পাঞ্জেরী কবিতায় সে কথা এভাবে ব্যক্ত হয়েছে:

'রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?
এখনো তোমার আসমান ভরা মেঘে?
সে তারা, হেলাল এখনো ওঠেনি জেগে?
তুমি মাস্তুলে আমি দাঁড় টানি ভুলে;
অসীম কুয়াশা জাগে শূণ্যতা ঘেরি।
রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?'[৮]

দারিদ্র্য অজ্ঞতা এবং নানা রকম অনাচার একদিকে যেমন মুসলিম সমাজকে বিপন্ন করে তুলেছে, অন্যদিকে তেমনি বিজাতীয়, মানবতা-বিরোধী সভ্যতা সমাজের সনাতন মূল্যবোধ বিনষ্ট করতে সচেষ্ট। এ কঠিন বিপর্যয়কর মুহূর্তে একমাত্র হেরার মহান শিক্ষাই মুসলিম জাতিকে রক্ষা করতে পারে, জীবনের সব গ্লানি ও দুর্গতি মোচন করে নবজীবনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে।[৯] জীবনের সে নব-উত্থানের পথে চলার জন্য সার্থক দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন কবি:

''এখানে এখন রাত্রি এসছে নেমে
তবু দেখা যায় দূরে বহদূরে হেরার রাজ তোরণ
এখানে এখন প্রবল ক্ষুধায় মানুষ উঠেছে কেঁপে,
এখানে এখন অজস্র ধারা উঠেছে দু'চোখে ছেপে
তুব দেখা যায় দূরে বহুদূরে হেরার রাজ-তোরণ...[১০]

আঁধারের পর আলো এবং রাত্রি শেষে দিনের আবির্ভাব যেমন অনিবার্য তেমিন সকল জড়তার পরেও ইসলামের নবজাগরণ অবসম্ভাবী। কবি তাই দিব্য দৃষ্টিতে এক দীর্ঘ তমাসাচ্ছান্ন যুগের অবসান প্রত্যক্ষ করেছেন।

''কাকর বিছানো পথ,
কত বাঁধা, কত সমুদ্র, পর্বত,
মধ্য দিনের পিচাসের হামাগুড়ি
শুকনি ফেলেছে ছায়া আমাদের মাথার উপরে উড়ি'
ফেলেছি হারায়ে তৃণঘন বন, যত পুস্পিত বন,
তবু দেখা যায় দূরে বহুদূরে হেরার রাজ-তোরণ...
শাহী দরজার সকল কপাট অনেক আগেই খোলা,
অনেক আগেই সেখানে দ্বাদশী জোছনা দিয়েছে দোলা।[১১]

এরপর আর হতোদ্যম হওয়ার অবকাশ নেই। কবি তাই দ্বিধা-শঙ্কায় ম্রিয়মান, আশা-হতাশায় দোদল্যমান মুসলিম জাতিকে আবেগ উদ্দীপ্ত কণ্ঠে নবজাগরণের আহ্বান জানানা।[১২]

''হে মাঝি!এবার তুমি পেয়োনা ভয়,
তুমিও কুড়াও হেরার পথিক-তারকার বিস্ময়,
ঝ'রুক এ ঝড়ে নারঙ্গী পাতা, তবু পাতা অগণন
ভিড় করে-যেথা জগছে হেরার রাজ-তোরণ।

সে পথে যদিও পার হতে হবে মরু
সে পথে যদিও দরিয়ার নোনা পানি
তবুও সে পথে আছে মঞ্জিল, জানি আছে ছায়াতরু
পথে আছে মিঠা পানি।''[১৩]

(গ) খোলাফায়ে রাশেদিনের স্তুতি

মহানবী (সা.) ছিলেন মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ। তাঁর সান্নিধ্যে যারা এসছেন তারাও অসাধারণ বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়েছে। যেমন আবু বকর (রা.) যিনি সর্বপ্রথমে ইসলাম গ্রহণকারী পুরুষ। রাসুল (সা.) এর দ্বীনের দাওয়াত পাওয়ার সাথে সাথে নি:সংকোচে তা গ্রহণ করে আজীবন মহানবীর (সা.) একান্ত ঘনিষ্ঠ সাথী হিসাবে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আনজাম দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন:

''দরদী বুকে প্রেম সমুদ্র। বিরাট স্নেহের সে কী পাথার।
নিল সে তনুতে সাপের ছোবল, নিল সে আঘাত, অত্যাচার।
সেই সমব্যথী হেসে নেয় দেহে বিষ-দংশন, বিষের চুম,
তার বিশ্বাসী কোলে বি-শ্রান্ত নবীজীর ভাঙে না ঘুম।
অনুপ্রাণিত সে মহা আদর্শে চিত্ত যে তার সুরভি 'লালা'
সব শ্রমিকের সাথে সে সমান খলিফা মহান-ফিরিওয়ালা।
ইসলাম তরী ভাসালো আবার নিখিল মানসে আবু বকর;
নবীজীর সাথী, ইসলাম-সাথী, মোমিন-সঙ্গী শ্রেষ্ঠ নর।''[১৪]

বিশ্ব-ইতিহাসে ন্যায় পরায়ণ খলিফা এবং কেঠোর ও সুযোগ্য শাসক হিসাবে সুপরিচিত হযরত ওমর ফারুক (রা.) ছিলেন মহানবীর (সা.) চরিত্রের আর এক প্রতিচ্ছবি। ইসলামের ন্যায় বিচার, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও মানব কল্যাণ তার শাসনামালে বাস্তবরুপ পরিগ্রহ করে। এই মহান ব্যাক্ত সম্পর্কে কবি বলেন:

''শুকনো খোর্মা খেজুরে তৃপ্ত
সে খলিফাতুল মুসলেমীন
সত্য, ন্যায়ের মাঠে এনেছিল
সব মানুষের মুক্ত দিন।
এখানে কেবল আর্তস্বর
এখানে তোমার নাই খবর
পড়ে আছে যেন শ্রান্ত শব

আজকে এখানে নাই ওমর।''[১৫]

ওমর (রা.) খেলাফত কালের গৌরবময় অতীতের দিনগুলো স্মরণ করে কবির মন ব্যথিত। বর্তমান পৃথিবীর জীর্ণ, স্খলিত রূপ দেখে কবির মন ক্ষুব্ধ। বর্তমান বিশ্বে ওমরের মত শাসকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে কবি বলেন-

''আজকে উমর পন্থি পথীর দিকে দিকে প্রয়োজন
পিঠে বোঝা নিয়ে পাড়ি দেবে যারা প্রান্তর প্রাণ-পণ,
উষর রাতের অনাবাদী মাঠে ফলাবে ফসল যারা,
দিক দিগন্ত তাঁদের খুঁজিয়া ফিরিছে সর্বহরা।
.....
যারা খুলিয়াছে রুদ্ধ মনের সঙ্কীর্ণতা খিল
দারাজ দিলের আরশির ছায়া ধ'রেছে দারাজ দিল্
.....
লু হাওয়ায় হেথা তীব্র পিপাসা মৃত্যুর হাহাকার:
আজকে এখানে নিশীত-প্রহরী উমর জাগে না আর।
তুব অতীতে প্রশ্বাসে আজও ভরে নিখিল,
দারদী উমর! বন্ধু উমর। দারাজ দিল।''[১৬]

ইসলামের তৃতীয় খলিফা ছিলেন হযরত ওসমান (রা.) তিনি ছিলেন অঢেল সম্পদের মালিক। তবে সম্পদের মোহ তাকে দ্বীনের পথ থেকে এতটুকু বিচ্যুত করতে পারিনি। ইসলামকে বিজয়ী শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করতে স্বীয় সম্পদকে জনহিতকার কাজে ব্যয় করেছিলেন অকাতরে। এ কারণে তিনি গণি (দানশীল) নামে ইতিহাস খ্যাত। কবির কণ্ঠে:

সেই সত্য প্রতিষ্ঠার দিনে
বিশাল বিশ্বের ভান্ডার তব ঈমানের পথ নিল চিনে
ক'রে গেল সীমাহীন দান,
বিশাল বিশ্বের বুকে চিরস্থায়ী করে গেলে
মানুষের বিপুল সম্মান।[১৭]

তার খেলাফত কালে কুরআন সংকলিত হয়েছিল। কুরআনের প্রচার প্রসার হয়েছিল ব্যাপকভাবে।

কুরআনকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করতে কুরআনের সহী কপি থেকে অনুলিপি তৈরী করে তা বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করেন। এ বিশেষ খেদমতের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। এ সম্পর্ক কবি বলেন:

''কোরান একত্র করে রাখিল যে সত্যের সম্মান,
নিজের পরাণ দিয়ে রেখে গেল পিরানের মান[১৮]

চতুর্থ খলিাফা আলী (রা.) বীরত্ব ও ন্যায়পরায়নতার যেমন ছিলেন অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব আবার তেমিন ইসলামের তত্ত্বজ্ঞানেও তিনি ছিলেন অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী। তার কিংবন্তীতুল্য বীরত্বের বর্ণনায় কবি বলেন:

'মরু আফতাব উড়ে চলে তার ঘোড়ার খুরে,
তলওয়ার খাপে সূর্যের খা'ব প'ড়ছে ঝু'রে,
চমকালো ঐ দিগন্তে ওকি বজ্র-নার,
অথবা আলীর শাণিত দুধারী জুলফিকার?[১৯]

কবি মহাবীর আলী (রা.) বীরত্ব-গাঁথা বর্ণনার সাথে সাথে ভবিষ্যতের নতুন উজ্জ্বল দিনের প্রত্যাশায় ব্যাকুল। তাই আশা ও আশ্বাসে পূর্ণ তাঁর আবেগময় বর্ণনা:

''সিংহ-নখর ছিঁড়ে ফেলে যথা ভীরু দুম্বার ঝুঁটি
জানি খায়রার প'ড়েছে তেমনি তোমার আঘাতে লুটি
তিমির প্রান্তে দেখি হেলালের নবীন অভ্যুদয়,
দ্বীন ইসলাম পড়েছে ছড়ায়ে নিখিল বিশ্বময়,
আরবী তাজীতে কাসেদ ছুটেছে নাই তার অবসর,
রুদ্ধ দুর্গ দুয়ারে ভেঙেছে মহাবীর হায়দার,
তার পথ দিয়ে আসিছে খালেদ, আসিছে তারেক, মুসা
সুবে সাদিকের বন্দরে ভেঙে আসিছে রক্ত-ঊষা।
.....
আট কেল্লার রুদ্ধ প্রকার আজিকে হয়েছে গুঁড়া
কুল মখলুক হ'তে দেখা যায় আল হেলালের চূড়া,
তার তকবির শোনা যায়, পিছে ওঠে জনতার স্বর;
আলী হায়দার! আলী হায়দার আসে আলী হায়দার![২০]

(ঘ) কারবালার বিষাদময় ঘটনার বিবরণ

ইসলামের ইতিহাসে কারবালা এক অতিশয় বিষাদময়, হৃদয়-বিদারক ঘটনা। যেমন লোম হর্ষক তেমিন ইসলামী আদর্শকে সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে মানবীয় সাহস ও প্রতিরোধের অতুলনীয়, অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ। হযরত হোসেন (রা.) এবং তাঁর পরিবার পরিজনের এ আত্মত্যাগ ইসলামের ইতিহাসে বিষাদ স্মৃতি বিজড়িত এক মহান অনুপ্রেরণাদায়ক ঘটনা। এ ঘটনা নিয়ে যুগে যুগে বহু কবি সাহিত্যিক বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। ফররুখ আহমদ এ বিষয় কবিতা লিখে তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। কবির কণ্ঠে:

''বাজে রণ বাজা এজিদের দল তলোয়ার তীর নেজার ছায়,
জাগে শঙ্কার কাঁপন আকাশে, লাগে মৃত্যুর রং ধুলায়,
সে রণ ভূমিতে ক্লান্ত সিংহ চলে একা বীর মরণাহত;
ক্ষত তনু তার তীরের আঘাতে লুটালো বিশাল শিলার মত।
জীবন দিয়ে যে রাখল বাঁচায়ে দ্বীনী ইজ্জত বীর জাতির
দিন শেষে হায় কাটলো শত্রু সীমার সে মৃত বাঘের শির।
তীব্র ব্যাথায় ঢেকে ফেলে মুখ দিনের সূর্য অস্তাচলে,
ডোবে ইসলাম-রবি এজিদের আঘাতে অতল তিমির তলে,
কলিজা কাঁপায়ে কারবালা মাঝে ওঠে ক্রুন্দন লোহু সফেন
ওঠে আসমান জমিনে মাতন; কাঁদে মানবতা: হায় হোসেন।।''[২১]

(ঙ) মহানবী মুহাম্মদ (সা.) এর প্রসংশা বর্ণনা

মহানবীর আগমনে সারা আরব জাহান থেকে অন্ধকার বিদূরিত হয়েছিল। অসভ্য বর্বর জাতি পেয়েছিল আদর্শ ভিত্তিক জীবনযাত্রার স্বাদ। যার বদৌলাতে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সাম্যের সমাজ সেই মহামানবকে উদ্দেশ্য করে কবির উক্ত:

''গলেছে পাহাড় জ্বলেছে আকাশ জেগেছে মানুষ তোমার সাথে
তোমার পাথের যাত্রীদের কভু থামেনি চরম ব্যর্থতাতে
তাই সিদ্দিক পেয়েছে বক্ষে আসন সত্য সিন্ধুদোল
তাই উমর পাতার ডেরায় নিখিল জনেরও কলরোল
তাই ওসমান খুলে গেল দ্বার অতুলন দিল মনি কোঠায়
তাইত আলীর হাত চমকায় বাঁকা বিদ্যুৎ জুলফিকার

খালেদ, তারেক ঝান্ডা উড়ায় মাশুকের বুকে প্রেমের টান
মহাচীন মুখে ফেরায়ে কাফেলা জ্ঞান যাত্রীরা করে প্রয়াণ।''[২২]

(চ) মুসলিম মনীষীদের জীবন কথার বর্ণনা

কবি ফররুখ আমাদের ঐতিহ্যক জীবনের পথ দেখিয়েছেন। তিনি মুসলিম জাতিকে জাগরণী বাণী শুনিয়েছেন। তিনি ধর্মের পথে, তাওহীদের পথে উৎসাহিত করেছেন। ইসলামী জীবনাদর্শের সুমজ্জ্বল জ্যোতিস্ক বিশেষ চারজন দ্বীনের মহান প্রচারকের জীবনাদর্শ কাব্যে বিবৃত করেছেন। কবির কণ্ঠে:

''চলেছে ধ্যানের জ্ঞান-শিখা বয়ে জিলানী বীর, চিশতী বীর
রঙিন করি মারি সূরাহী নক্‌শাবন্দের নয়ন নীর,
জ্ঞানের প্রেমের নিশান তুলেছে হাজার সালের মুজাদ্দিদ
রায় বেরেলীর জঙ্গী দিলীর ভেঙ্গেছে লক্ষ রাতের নিঁদ
ওরা গেছে বহি তোমার নিশান রেখে গেছে পথে সেই নিশানি।
তবু সে চলার শেষ নেই আর, কোন দিন শেষ হবে না জানি।
লাখো সামাদান জ্বলে অফুরান রাত্র তোমার রশ্মি স্মরি
সে আলোবিভায় মুখ তুলে চায় প্রাণ পিপাসায় এ শর্বরী।''[২৭]

মহামানবদের জীবনাদর্শ মানবজাতির কাছে সমুজ্জ্বল আলোক বর্তিকা। মহামানবগণ কবির নিকট সত্য, ন্যায়, কল্যাণ ও মানবতার প্রতীক। কবি মনে করেন পথ ভ্রষ্ঠ মুসলিম জাতিকে সঠিক পথের দিশা পাওয়ার উদ্দেশ্যে আজও গাওসুল আজমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। কবি তাই বলেন:

''দুর্গম বন্ধুর পথে জীলান সূর্যের হাতছানি
পরিপূর্ণ সেই সূর্য ক্রমাগত ডাকে আর ডাকে
কাফেলার পথ ছেড়ে যে ফিরে তিমির-দুর্বিপাকে
জীলান সূর্যের রশ্মি তার চোখে দাও আনি।''[২৮]

প্রবল প্রতাপশালী মোগল সম্রাট আকবর কর্তৃক নতুন ধর্ম ''দ্বীনে এলাহী'' প্রবর্তনের বিরুদ্ধে তৌহিদের ঝান্ডা নিয়ে মাথা উচু করে দাড়ালেন হযরত আহমদ সিরহিন্দী। এ জন্য তাকে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়। রাজ শক্তির মোকাবেলায় জিহাদ পরিচালনা করে ইসলামকে ভারতবর্ষে নতুন করে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন।

এজন্য তাকে ''মুজাদ্দিদ আলফেসানী'' (হাজার বছরের সংস্কারক) নামে অভিহিত করা হয়। রাসুল (সা.) এর এক হাজার বছর পরে এই মহামানবের আগমন ঘটে বলে তাকে এই অভিধায় ভূষিত করা হয়। এই মহামানব সম্পর্কে কবি বলেন:

''হাজার বছর পরে সে হিলাল উঠেছিল জেগে
হিন্দী বোত-খানা ফুড়ে' নিখিল বিশ্বের কূলে কূলে,
অগণন মিথ্যাচারে নমরুদের সাজানো পুতুলে
বিপুল আঘাত হেনে লক্ষ সমুদ্রের প্রাণাবেগে
কোটি শুষ্ক গুলিস্তানে এনেছিল জোয়ার আবেগে
মুক্তি প্রাণ ধারা!-তবে পারেনি রুধিতে কারা-দ্বারা;
সেলিমের শিরস্ত্রাণ ধুলায় হয়েছে একাকার।
মুক্ত প্রাণ সাধকের সত্যের দুর্জয় স্রোতাবেগে।''[২৯]

প্রাচীন সভ্যতার দেশ ভারতবর্ষ। এখানে যখন অন্যায়-অনাচার জুলুম-নির্যাতন, অবিচার ও অজ্ঞতা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তখন দ্বীনের মশাল নিয়ে ভারতবর্ষে আগমন করেছিলেন হযরত খাজা মঈন উদ্দীন চিশ্‌তি (রহ.)। তিনি ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে এক অপরিসীম রহমত ও নিয়মত স্বরুপ। কবি সে সম্পর্কে বলেন:

''ইন্দ্রপ্রস্থ ঘননীল যবনিকা অন্তরালে ঢাকি'
যে দিল হেলাল দীপ্তি উদ্ভাসিত সমগ্র আকাশ
তোমার আশিক দিল, পথ-শ্রান্তি বহু দূরে রাখি
প্রেমের বন্যায় তুমি হে তাপস! আনিলে আশ্বাস
অফুরন্ত জীবনের। বহু শতাব্দীর মারী বিষ
(জড়ায়ে ছিল যে মিথ্যা হিন্দের কলুষ মৃত্তিকায়)
আবহায়াতের ধারা তার বুকে ছড়ালো আশীষ,
সত্যের প্রোজ্জ্বল শিখা দীপ্ত হলো রাত্রির হাওয়ার''[৩০]

(ছ) রমযান মাসের ফজিল ও করণীয় সম্পর্কে

কবি ফররুখ আহমদ ছিলেন ইসলামী আদর্শে দৃঢ় বিশ্বাসী। ইসলামীভাবধারা ও উপজীব্য বিষয় নিয়ে কবিতা লেখার যে দৃষ্টান্ত কবি কাজী নজরুল ইসলাম উপস্থাপন করেন কবি ফররুখ আহমদ সে ধারারই যোগ্য উত্তরসূরী। তিনি মনে করতেন মুসলমানদের অধ:পতনের কারণ হলো ইসলামী আদর্শ থেকে বিচ্যুতি। ইসলামী ঐতিহ্য ও আদর্শবোধে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে মুসলমানদের সম্বিৎ ফিরতে পারে এটা ফররুখ আহমদ বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু করেছেন ইসলামের বিবিধ বিষয়াবলী। যেমন 'রমযান' শিরোনামে তাঁর কবিতা:

''আসিল রমযান মোবারক নিখিল জাহানে ফিরে
বাঁকা ঐ চাঁদের রেখা দেখি যে বনানী শীরে।।
পাপের দহনে ধরা ছিল যে মুর্চ্ছাহত
খোদার রহম আজি নামিল ধরনী ঘেরে।।
পাপী ও তাপীরে দিতে বারতা জান্নাতেরি
ক্ষমা ও দয়ার বাণী আনিল প্রাণের তীরে।।
সাধনা সংযমেরী এ মাসে পূর্ণকামী
জাগো যে নারী ও নর বেদনা ও অশ্রু নীরে।।
কে আছো মুক্তিকামী পাপের কুহক জালে
হে সাধক এস উঠে আনত চিত্তে ধীরে।।''[৩১]

(জ) হক এবং বাতিলের পার্থক্য বর্ণনায় কবির কাব্য

সত্য ও মিথ্যার চিরন্তন দ্বন্ধের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে সূরা আনকাবুতে। যারা এ দ্বন্ধে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অপরকে সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করে তাদের তুলনা করা হয়েছে মাকড়সার সাথে। যেমন 'মাছালুল্লাজিনা ত্তাখাজু মিন দুনিল্লাহে আওলিয়া কা মাছালিল আনকাবুত' যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে সাহায্যকারীরুপে গ্রহণ করে তাদের উপমা মাকড়সা। কবি সুরার মূল বক্তব্যে সত্য মিথ্যার দ্বন্ধের সাথে মাকড়সার উপমা টেনে এনেছেন তার লেখায় সুনিপুন ভাবে। যেমন:

''কে জ্ঞানী? অজ্ঞতা কার আত্মঘাতী? জানি না তা আমি,
কিংবা কার অভিজ্ঞতা দুনিয়ার চেয়ে ঢের দামী
জানি না, মেলেছি চোখ পৃথিবীতে স্বপ্নালোকে যেন,
মিথ্যা ও সত্যের দ্বন্ধ তবু মনে জেগে ওঠে কেন?
সহস্র ঊর্নার মতো তবু যেন সংশয় হাজার
সূক্ষ্ম ঊর্ণনাভ জাল ফেলে প্রাণে ছায়া তিক্তকার?''[৩২]

(ঝ) কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের মর্মবণী

কবি আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের মর্মবাণী তাঁর কাব্যে অত্যন্ত চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সুরা আরাফে বর্ণিত চরম সত্যকে কবি তুলে ধরেছেন তার লেখায়। আরাফে বলা হয়েছে-''ওয়াল বালাদু তাইয়েবু ইয়াখরুজ নাবাতুহু বি ইজনি রাব্বিহি ওয়াল্লাজী খাবুছা লা ঈয়াখরুজু ইল্লা নাকিদা।'' যে জমিন

উৎকৃষ্ঠ তাতে আল্লাহর ইচ্ছায় শস্য উদগত হয় আর যে জনি অনুন্নত তাতে অল্পই ফসল ফলে। একথায় কবি বর্ণনা করেছেন শিল্পীর শৈলীতে

''করো না অন্যের ক্ষতি, করো না অন্যায় পৃথিবীতে
যে করে অন্যের ক্ষতি ক্ষতিগ্রস্থ হয় নিজে আর
বদকাজে বদী ফলে; মন্দ কাজ দেয় না সুফল কোন দিন।
যে করে কদর্য পাপ অথবা অন্যায় ধ্বংস করে নিজ সত্তা নিজ হাতে;
পায় প্রতিফল এক দিন হুকুমে আল্লাহ।''[৩৩]

শিল্প-সচেতনতার সাথে একাকার হয়ে আছে কবির কোরআনী শিক্ষার চতনাবোধ। কুরআন মানুষকে জানিয়ে দিয়েছে জুলুমশাহী কখনো টিকে থাকতে পারে না। জুলুমের ইতিহাস উল্লেখ করে কুরআন তা বারবার জানিয়ে দিয়েছে মানবজাতিকে; যেমন-''আমি কারুন, ফেরাউন ও হামানকে ধ্বংস করেছি। মুসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নির্দশনাবলী নিয়ে এসেছিলেন। অতঃপর তারা দম্ভ করেছিল, কিন্তু তারা জেতেনি। (আনকাবুত)। একথায় কবির কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছে বারবার। তিনি লিখেছেন:

''এ কথা ভেবনা তুমি, অত্যচারী জালিমের ভয়ে
থেমে যাবে মানুষের মনুষ্যত্ব। জুলুমশাহীর
ত্রাসনে হয়নি শেষ কোন দিন ধর্ম, নীতি; শুধু
মিটে গেছে জালিমের নাম ও নিশানা।[৩৪]

(ঞ) আল-কুরআনের কাব্যানুবাদ

ফররুখ প্রতিভার একটি উজ্জ্বল দিক হলো অনুবাদ প্রতিভা। মৌলিকভাবে ফররুখের অনূদিত কবিতা দু' ধরনের: আল-কোরআনের অংশ বিশেষ এবং ইকবালের কিছু নির্বাচিত কবিতা। ফররুখ অনুবাদ করেছেন পুরো ''আমপারা'' এব সূরা বাকারা, ইয়াসিন, দাহার, মুনাফিকুন, তাগাবুন, কলম, মুলুক, নূহ, মুজ্জামিমল ইত্যাদি। সূরা বাকারার প্রথম কয়েকটি আয়াতের কাব্যানুবাদ করেছেন ফররুখ আহমদ নিম্নে তা বিবৃত হলো:

''আলিফ, লাম, মীম
মহাপ্রজ্ঞার পূর্ণ আধার আল্লাহ মহামহিম
অবতীর্ণ এ গ্রন্থ কোরআন সব সংশয়হীন
চালকবন্ধু তাহাদের, যারা সংযমী নিশিদিন
বিশ্বাস যারা রাখে আড়ালেও প্রতারণা নাহি জানে
প্রার্থনা যারা করে নিয়মিত প্রতিষ্ঠা সবখানে
আমাদের দেয়া সম্পদ হতে ব্যয় করে যারা আর
বিশ্বাস করে তোমাদের প্রেরিত মম বানী সম্ভর''

কবি ফররুখ আহমদের সুরা ফাতেহার কাব্যানুবাদ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

''শুরু করি নিয়ে আল্লাহর নাম মহামহিম
প্রভু সমহান, যিনি রহমান, যিনি রহিম।
সব প্রশংসা আল্লার, যিনি রাব্বুল আলামিন
যিনি রহমান, করুণা নিধান, পরম কৃপালু যিনি,
মহাবিচারক দাস্য, তব ইবাদত করি শুধু মোরা প্রভু
তোমারি সমীপে যাচি মোরা শুধু সহায়তা শেষহীন।
চালাও মোদের সরল ও দৃঢ় তাদের সঠিক পথে
যারা পেল তব দান অফুরান, করনা অপরিসীম।
চালায়নো তুমি মোদেরকে প্রভু তাদের ভ্রান্ত পথে
অভিসপ্ত বা যাহারা ভ্রান্তলীন''

সুরা বাকারার ১৮৬ নং আয়াত অবলম্বনে কাব্য রচনা:

'শোন রাব্বানা, হে মহাপালক এ বিশ্ব চরাচরে
যদি ভূলে যাই, ভ্রমে পড়ি যদি ধরিয়ো না কৃপাভবে।
যে বিপুল ভার দিলে তুমি প্রভূ অতীতের নারী নরে।
শোন রাব্বানা, দিয়ো না যে বোঝা বওয়ার শক্তি নাই,
সাধ্যের অতিরিক্ত যা প্রভূ তা থেকে মুক্তি চাই।
করো আমাদের পাপ মার্জনা, ঢাকো দোষ-ত্রুটি, বিলাও করুণা,
হে আলমপনা, মালিক মহান তুমি আমাদের তরে,
পূর্ণ বিজয় দাও আমাদের কাফির জাতির পরে।[৩৫]

(চ) ইসলামী সঙ্গীত

ইসলামী রেনেসাঁর কবি ফররখ আহমদের বহুমাত্রিকতা সুবিদিত। কাব্য ক্ষেত্রে তিনি যেমন প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন তেমনি তিনি বিপুল সংখ্যক গানও রচনা করেছেন। বর্তমানে গানের জগতে ইসলামী গান একটি পৃথক মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যে ভাস্কর। তাঁর রচিত ইসলামী গানও এ বিশেষ স্বতন্ত্র ধারাকে সমৃদ্ধ করেছে। তিনি হামদ, নাত, নামাজ, জুমা, মুহাররম, রবিউল আওয়াল, ঈদে মিলাদুন্নবী, দোয়া ও রাসুলের প্রতি প্রেম ও ইসলামের প্রতি তাঁর অকৃতিম অনুরাগ ও বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটেছে। যেমন ''আরজ শোন খোদা'' শিরোনামে তার একটি মোনাজাত:

''আরজ শোন খোদা, আমার খাতেমা বিল খায়ের করো।
শেষ হলে দিন এই দুনিয়ার খাতেমা বিল খায়ের করো।
সংশয়েরী ঘূর্ণি হায় কমজোর আজ ঈমান মোর
দাও ঈমানের পূর্ণতা আর খাতেমা বিল খায়ের করো।
লোভ লালসার বদ্ধ জীবন অন্ধ ভয়ের জিন্দানে
ভাঙো আগল ভয় ভীরুতায়; খাতেমা বিল খায়ের করো।
মুনাফিকের মৃত্যু যেন না আসে মোর তকদিরে
দাও গো সুযোগ শহীদ হওয়ার, খাতেমা বিল খায়ের করো।''[৩৫]

উপসংহার

ফররুখ আহমদের সঙ্গীতের মধ্যে আল্লাহ ও রাসুল (সা.) এর প্রেমের প্রকাশ যেমন লক্ষ করা যায় তেমনি তার সমগ্র সাহিত্য কর্মের মধ্যে একটি বিরাট অংশ জুড়ে আছে ইসলামী সাহিত্য। তিনি ব্যক্তি জীবনে ও আচার আচারণে ছিলেন ইসলামী জীবনাদর্শের একনিষ্ঠ অনুসারী। এজন্যই তাঁর পক্ষে এত নিবিড় অনুভূতিজাত ইসলামী ভাবাপন্ন সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১। ফররুখ আহমদ, *সিরাজাম মুনিরা*, পৃ. ২৭।

২। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮

৩। ফররুখ আহমদ, *সাত সাগরের মাঝি*, (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ ২০১৪), তৃতীয় মুদ্রণ, পৃ. ৫৯।

৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

৫। অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ আহমদের সাত সাগরের মাঝি*, পৃ. ২৭-২৮।

৬। ফররুখ আহমদ, *সাত সাগরের মাঝি*, পৃ. ৯।

৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

৯। অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ প্রতিভা*, পৃ. ২২৩।

১০। ফররুখ আহমদ, *সাত সাগরের মাঝি*, পৃ. ৬১।

১১। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

১২। অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ প্রতিভা*, পৃ. ২২৪।

১৩। ফররুখ আহমদ, *সাত সাগরের মাঝি*, পৃ. ৬২।

১৪। অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ প্রতিভা*, পৃ. ৩৮।

১৫। অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ প্রতিভা*, পৃ. ২৭৭ ও ফররুখ আহমদ, *সিরাজাম মুনিরা*, পৃ. ৪২।

১৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮-২৭৯ ও ফররুখ আহমদ, *সিরাজাম মুনিরা*, পৃ. ৪৬-৪৮।

১৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯ ও ফররুখ আহমদ, *সিরাজাম মুনিরা*, পৃ. ৫০।

১৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯।

১৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১ ও ফররুখ আহমদ, *সিরাজাম মুনিরা*, পৃ. ৫২।

২০। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২ ও ফররুখ আহমদ, *সিরাজাম মুনিরা*, পৃ. ৫৮।

২১। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১ ও ফররুখ আহমদ, *সিরাজাম মুনিরা*, পৃ.৬০।

২২। *ফররুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য*, মুহাম্মদ মতিউর রহমান-সম্পাদিত, পৃ. ১৮১ ও ফররুখ আহমদ, *সিরাজাম মুনিরা*, পৃ. ৩৪।

২৩। *ফররুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য*, মুহাম্মদ মতিউর রহমান-সম্পাদিত, পৃ. ৯২ ও ফররুখ আহমদ, *সিরাজাম মুনিরা*, পৃ. ৩৫।

২৪। অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ প্রতিভা*, পৃ. ২৮৯ ও ফররুখ আহমদ, *সিরাজাম মুনিরা*, পৃ. ৬৭।

২৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০ ও ফররুখ আহমদ, *সিরাজাম মুনিরা*, পৃ. ৬৯।

২৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯ ও ফররুখ আহমদ, *সিরাজাম মুনিরা*, পৃ. ৬৮।

২৮। *ফররুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য*, মুহাম্মদ মতিউর রহমান-সম্পাদিত, পৃ. ২১৯।

Dhaka University Institutional Repository

২৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯-২২০।

৩০। প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯

৩১। *ফররুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য*, মুহাম্মদ মতিউর রহমান-সম্পাদিত, পৃ. ৫৬৯-৫৭১।

৩২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৩-৫০৫।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়ঃ

উভয় কবির ইসলামী চেতনার তুলনামূলক পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

(ক)

আহমাদ মুহাররামের রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ভূমিকা

আরবী সাহিত্যের নব্য-প্রাচীন পন্থী কবি সম্প্রদায়ের অন্যতম একজন হলেন আহমাদ মুহাররাম। তিনি ছিলেন ইসলামী ভাবধারা সম্পন্ন কবি। কবিতার মাধ্যমে তিনি তাঁর ইসলামী চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। ভাষা-সাহিত্যে তাঁর ছিল অগাধ পান্ডিত্য। ইতিহাস বিশেষ করে ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পরিলক্ষিত হয়।[১] তাঁর সাহিত্যিক জীবন যোগ্যতা, শক্তি ও আভিজাত্যে পরিপূর্ণ। ১৯১০ সালে বিচারকদের রায়ে তিনি নীলনদের কবিদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করেন। এই মহান কবির অসংখ্য গদ্য ও পদ্য বিভিন্ন সাময়িকী ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।[২] নিম্নে তাঁর সাহিত্যিক অবদানের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো:

১। **দিওয়ানু মুহাররাম ১ম খন্ড :** এই গ্রন্থে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সাময়ীকিতে প্রকাশিত তাঁর লিখিত কবিতাসমূহ স্থান পেয়েছে।

২। **দিওয়ানু মুহাররাম ২য় খন্ড :** এই গ্রন্থে ১৯০৮ সাল হতে ১৯২০ সাল পর্যন্ত কবিতাসমূহ স্থান পেয়েছে।[৩] পরবর্তীতে আহমদ মুহাররামের ছেলে মাহমুদ তাঁর দিওয়ানের সকল কবিতাসমূহ নতুন আঙ্গিকে সন্নিবেশিত করে ৬ খন্ডে তা প্রকাশ করেন।[৪]

৩। আহমাদ মুহররাম ১৬ বছর বয়সে 'মুয়াল্লাকা' নামীয় বিখ্যাত কবিতা রচনা করেন যা সায়্যেদ আবু নছর আল-ছালাবী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ عكاظ الأدب (উকাজুল আদব) গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। এই কাব্য সংকলনে অন্তর্ভূক্ত সাত কবির মধ্যে অবশিষ্ট ছয়জন হলেন সায়্যিদ তাওফীক আল-বিকরী, শায়খ আব্দুল জলীল, জামীল আফিন্দী যাহাবী আল বাগদাদী, শাওকী বেগ, মুহাম্মদ ওয়ালী উদ্দীন বেক ইয়াকুন ও উকাজের পরিচালক। মুহাররামের উক্ত মুয়াল্লাকার প্রথম চরণটি নিম্নরুপ:

منازل سلمى لا عدتك الغمائم وإن درست بالجزع منك المعالم

'ওহে সালমার বাড়ি ঘর! বৃষ্টিপাত তোমাকে সিক্ত না করুক, যদিও তোমার নিদর্শন সমূহ আর্তনাদ করতে করতে নিশ্চিহ্ন হয়েছে।'

৪। ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট শোকগাঁথা, ফিলিস্তিনের ঘটনাবলী এবং বিভিন্ন বিষয়ের শত শত দীর্ঘ কবিতা ও খন্ড কবিতা আছে যা ১৯২০ সালের পরে লেখা। এই কবিতাগুলো বিভিন্ন মিশরীয় ম্যাগাজিন ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীতে এগুলি আর সংকলন করা হয়নি।

৫। **নাকবাতুল বারামিকা :** এটি পাঁচটি অধ্যায় বিভক্ত একটি কাব্য নাটক।

৬। তিনজন কবির সমালোচনামূলক বিস্তারিত গবেষণা। এই তিনজন কবির নাম হলো আল-বিকরী, হাফিজ ইব্রাহিম এবং ঈসমাইল সাবরী।[৬]

৭। **'রাসুলের মোয়াজ্জিন বেলাল'** শিরোনামে তাঁর অপর একটি কাব্য নাটক আছে।[৭]

৮। **নাকবাতু ফিলিস্তিন** শিরোনামে তাঁর একটি জাগরণমূলক রচনা রয়েছে যা **১৯১৭** সালে বেলফোর ঘোষণার পরে রচনা করেন। বেলফোর ঘোষণার পর যে সমস্ত আরবীয় কবিরা জাতিজাগরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি এই কাব্যে ফিলিস্তিনিদের দুর্ভোগের কথা তুলে ধরে আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও যুদ্ধ পরিচালনার আহবান জানিয়েছেন। প্রথম চরণ-[৯]

৯। **দিওয়ানু মাজদিল ইসলাম বা ইলইয়াজাহ্ আল-ইসলামিয়্যাহ :** আহমাদ মুহাররাম তাঁর মৃত্যুর **১০** বছর পূর্বে অর্থাৎ **১৩৫৩** হিজরীতে এটি রচনা করেন। তাঁর মৃত্যুর প্রায় ২০ বছর পর **১৩৮৩** হিজরী সনে এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়।[১০] এটি মূলত চার খন্ডের একটি সু-বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ। যার প্রত্যেক খন্ডের শুরুতে দু'টি করে বিশেষ পৃষ্ঠা সংযুক্ত করা হয়েছে। যার প্রথমটিতে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ আয়াত এবং দ্বিতীয়টিতে জীবন চরিত ও এলমে মাগাজী সংক্রান্ত তাবেয়ীদের বাণী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[১১] আহমাদ মুহাররামের এই শাশ্বত সাহিত্যকর্মটি ধারাবাহিকভাবে 'আল-বালাগ', 'আল-ফাতহ' ও মাজাল্লাতুল আযহার' নামক পত্রিকায় প্রকাশ করতে না করতেই মিশর, সিরিয়া ও ইরাকের লেখকবৃন্দ এটিকে সাদরে গ্রহণ করেন। লেখক এটি তাঁর জীবদ্দশাতেই সমাপ্ত করেছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর আগে প্রকাশ করতে পারেননি। হস্তলিপি হিসেবেই অবশিষ্ট ছিলো।[১২] তাঁর মৃত্যুর পর **১৯৬৩** সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।[১৩] এই গ্রন্থটি মোট চার খন্ডে বিভক্ত। এর প্রথমে খন্ডে তিনি রাসুল (সাঃ) এর মাক্কী জীবন, হিজরত, মাদানী জীবন, মুহাজির ও আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন এবং ইহুদি ও নাসারাদের সাথে বিভিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহ ও এগুলোতে সাহাবাদের বীরত্ব প্রদর্শন ও আত্মোৎসর্গ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। **২য় ও ৩য়** খন্ড জুড়েও এতদ্সংক্রান্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে।[১৪] আর **৪র্থ খন্ডে** রাসুল (সা.) এর কাছে আগমনকারী প্রতিনিধি দলসমূহ এবং রাজা-বাদশাহদের কাছে প্রেরিত চিঠিপত্র ও দূতদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অত:পর রাসুল (সাঃ) কর্তৃক আরবদেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রেরিত অভিযান সমূহের আলোচনা করেছেন। মোট **১৬৪**টি কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে।[১৫] বলা হয়ে থাকে, একজন সত্যিকার কবির তিনটি প্রধান গুণ থাকা আবশ্যক। সুস্পষ্ট জীবনদর্শন, কাব্য আঙ্গিকের স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকত্ব এবং বক্তব্যে তীব্রতা। আহমাদ মুহাররাম কাব্যে এ তিনটি বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে বিদ্যামান। জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে ইসলামী মূল্যবোধ। যার প্রতিফল ঘটেছে তাঁর সমগ্র সাহিত্যে। তাই তিনি ইসলামের কবি হিসেবে আরবী কাব্যাঙ্গনে পরিচিত।

তথ্যসূত্র

১। আহমাদ আব্দুল লতীফ আল-জাদা ওয়া হুসনী আদ্‌হাম জারার, *শু'আরা আল-দা'ওয়াত আল-ইসলামিয়্যা ফি আল-আসর আল-হাদীছ*, পৃ. ৬৭।

২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯-৭০।

৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০, মুহাম্মদ ইবন সা'দ ইবন হুসাইন, *আল-আদব আল-হাদীছ তারীখ ওয়া দিরাসাত*, পৃ. ২০৩;

৪। মুহাম্মদ ইবন সা'দ ইবন হুসাইন, *আল-আদব আল-হাদীছ তারীখ ওয়া দিরাসাত*, পৃ. ২০৩; মুহাম্মদ ইবন সা'দ ইবন হুসাইন, *আল-আদব আল-আরবী ওয়া তারীখুহু, (আল-আছর, আল-হাদীছ)*, পৃ. ৬৩।

৫। আহমাদ মুহাররাম, *দিওয়ানু মাজদিল ইসলাম*, পৃ. ৯।

৬। আহমাদ আব্দুল লতীফ আল-জাদা ওয়া হুসনী আদ্‌হাম জারার, *শু'আরা আল-দা'ওয়াত আল-ইসলামিয়্যা ফি আল-আসর আল-হাদীছ*, পৃ. ৮০। মুহাম্মদ ইবন সা'দ ইবন হুসাইন, *আল-আদব আল-আরবী ওয়া তারীখুহু (আল-আছর, আল-হাদীছ)*, পৃ. ৬৩।

৭। মুহাম্মদ ইবন সা'দ ইবন হুসাইন, *আল-আদব আল-হাদীছ তারীখ ওয়া দিরাসাত*, পৃ. ২০৯;

৮। http://ar.wikipedia.org/wiki

৯। আহমাদ মুহাররাম, *দিওয়ানু মাজদিল ইসলাম*, পৃ. ৩১, আহমাদ আব্দুল লতীফ আল-জাদা ওয়া হুসনী আদ্‌হাম জারার, শু'আরা আল-দা'ওয়াত আল-ইসলামিয়্যা ফি আল-আসর আল-হাদীছ, পৃ. ৭০-৭১।

১০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

১১। http://ar.wikipedia.org/wiki, মুহাম্মদ ইবন সা'দ ইবন হুসাইন, *আল-আদব আল-হাদীছ তারীখ ওয়া দিরাসাত*, পৃ. ২০১।

১২। আহমাদ আব্দুল লতীফ আল-জাদা ওয়া হুসনী আদ্‌হাম জারার, *শু'আরা আল-দা'ওয়াত আল-ইসলামিয়্যা ফি আল-আসর আল-হাদীছ*, পৃ. ৭০।

১৩। আহমাদ মুহাররাম, *দিওয়ানু মাজদিল ইসলাম*, পৃ. ৩৬।

১৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

খ)

ফররুখ আহমদের রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ভূমিকা

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রতিভাবান কবি ফররুখ আহমদ। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবদান থাকলেও কবি হিসেবেই তিনি পরিচিত। কাব্যক্ষেত্রে বিভিন্ন আঙ্গিকে তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। গীতিকবিতা, গীতিনাট্য, সনেট, মহাকাব্য, কাব্যনাট্য, ব্যঙ্গ-কবিতা, ব্যঙ্গনাটক ও শিশুতোষ ছড়া-কবিতা ইত্যাদি কাব্যসাহিত্যে তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাছাড়া ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও উপন্যাসও রচনা করেছেন। সর্ব ক্ষেত্রেই তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ সুস্পষ্ট। ফররুখ আহমদ রচিত গ্রন্থবলীর সংখ্যা মোট ৫২টি।[১] তন্মধ্যে প্রকাশিত ৩৩, অপ্রকাশিত ১৯টি গ্রন্থ।[২] তবে অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান বলেন '' ফররুখ আহমদ প্রায় ৫০টি গ্রন্থের রচয়িতা। এর মধ্যে তাঁর জীবতকালে অতি অল্প সংখ্যক গ্রন্থই প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর পর তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও পান্ডুলিপি আকারে তাঁর আরো কিছু গ্রন্থের পান্ডুলিপি এবং অগ্রন্থিত বেশ কিছু কবিতা ও নানা ধরনের লেখা রয়েছে, যা এখনো গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়নি।''[৩]নিম্নে তাঁর রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতিসহ একটি তালিকা প্রদান করা হলো:

গীতিকাব্য

সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪), আজাদ কারো পাকিস্তান (১৯৪৬), সিরাজাম মুনীরা (১৯৫২) ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৭০), হে বন্য স্বপ্নেরা (১৯৭৬), কাফেলা (১৯৮০), হাবেদা মরুর কাহিনী (১৯৮১), কিস্‌সা কাহিনী (১৯৮৪)।[৪]

সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪) : এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে। প্রকাশক বেনজীর আহমদ, নওরোজ পাবলিশিং হাউজ, ১০৬-এ সার্কাস রোড, কলকাতা।[৫] ''সাত সাগরের মাঝি'' কবি ফররুখ আহমদের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। এটি তাঁর সর্বাধিক আলোচিত ও জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থও বটে। এই গ্রন্থটিই তাঁর কবি পরিচিতি নিশ্চিত ও প্রতিষ্ঠিত করে। এটি বাংলা সাহিত্যেরও উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই কাব্যগ্রন্থে সন্নিবেশিত কবিতাগুলির একটি হলো 'সাত সাগরের মাঝি' নামক কবিতা। এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা। এই কবিতাটির নামকরণেই কাব্যগ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে। ১৯৪৪ সালে এটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে কাব্যপ্রেমীদের মাঝে বিপুল সাড়া পড়ে যায়। কবি হিসেবে এটি তাঁর বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যকে স্পষ্ট করে তোলে। এই কাব্যগ্রন্থে সন্নিবেশিত কবিতাগুলো হলো: সিন্দাবাদ, বা'র দরিয়ায়, দরিয়ায় শেষ রাত্রি, শাহরিয়ার, আকাশ নাবিক, বন্দরে-সন্ধ্যা, ঝরোকায়, ডাহুক, এইসব রাত্রি, পুরনো মাজারে, পাঞ্জেরী, স্বর্ণ-ঈগল, লাশ, তুফান, হে নিশানবাহী, নিশান, নিশান বরদার, আউলাদ ও সাত সাগরের মাঝি। কবি ফররুখ আহমদ এ সকল কবিতায় রূপক উপমার মাধ্যমে অধ:পতিত মুসলিম জাতিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তিনি মুসলিম জাতির গৌরবময় ইতিহাস, প্রাণময় ঐতিহ্য ও মানবিক আদর্শের ভিত্তিতে অধ:পতিত মুসলিম

জাতিকে নবজাগরণের পথে আহ্বান জানান। তাঁর আহ্বানে মুসলিম জাতি ব্যাপকভাবে সাড়া দেয়। তাঁর কাব্য-কবিতা বাঙালি মুসলমানদেরকে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হতে এবং নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হতে অনুপ্রেরণা যোগায়। তাই চল্লিশ দশকের মুসলিম কবিদের মধ্যে তিনি সর্বাধিক উল্লেখযাগ্য ও জনপ্রিয় কবি হিসেবে সুপরিচিত।[৬]

আজাদ করো পাকিস্তান (১৯৪৬) : 'আজাদ করো পাকিস্তান' ফররুখ আহমদের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। এটি সর্বভারতীয় দাঙ্গার প্রেক্ষিতে দাঙ্গা বিরোধী একগুচ্ছ কবিতা।[৬] এতে মোট ১০টি কবিতা অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। সেগুলো হলো: 'ফৌজের গান, আজাদ করো পাকিস্তান, ওড়াও ঝান্ডা, কায়েদে আজম জিন্দাবাদ, নতুন মোহাররাম, পথ, পাকিস্তানের কবি (আল্লামা ইকবাল), রাত্রির অগাধ বনে, কারিগর এবং জালিম ও মজলুম।[৭] তখনকার রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং বিদ্যমান অবস্থা ও পরিবেশের প্রক্ষিতেই এ গ্রন্থের বিভিন্ন কবিতা রচিত। এই কাব্যের প্রথম কবিতার নাম 'ফৌজের গান'। গানটি মুসলিম জাতির নবজাগরনের ভাব-চেতনা ও উদ্দীপনাকে ত্বরান্বিত করেছে। গানটির আংশিক নিচে উদ্বৃত হলো:

সামনে চল্: সামনে চল্
তৌহিদেরি শান্ত্রীদল
সামনে চল্: সামনে চল্;
আসুক ডর, আসুক ভয়
আসুক হিম দুঃসময়-
আসুক দুঃখ পাষাণ বুক
মৃত্যুবাধা: ঝড় বাদল
সামনে চল্: সাম্নে চল্[৮]

এই কাব্যগ্রন্থটি বিশ্লেষণে মুহাম্মদ মতিউর রহমান বলেন যদিও পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমিতে এই কবিতাগুলো লেখা তবুও এর মধ্যে তিনটি কবিতা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময়কার ভাবধারা নিয়ে লেখা। একটি আল্লামা ইকবাল ও একটি কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সম্পর্কে লিখিত। অপর পাঁচটি ইসলামী আদর্শ, মুসলিম নবজাগরণ, সত্য-ন্যায় ও মানবতা বিষয়ক কবিতা। তৎকালীন মুসলিম জাতির আবেগ-অনুভূতির যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে এসব গান ও কবিতায়।[৯]

সিরাজাম মুনীরা (১৯৫২) : 'সিরাজাম মুনীরা' কবি ফররুখ আহমদের প্রকাশিত তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বরে মোট ১৯টি কবিতা নিয়ে 'সিরাজাম মুনীরা' প্রকাশিত হয় তমদ্দুন প্রেস ৫০ লালবাগ, ঢাকা থেকে।[১০] এই কাব্যের অন্তর্ভূক্ত কবিতাগুলো হলো: সিরাজাম মুনীরা, আবু বকর সিদ্দিক, উমর-দরাজ দিল, ওসমান গণি, শহীদে কারবালা, মন, এই সংগাম, প্রেম-পন্থি, অশ্রুবিন্দু, গাওসল আজম, মুজাদ্দিদে আলফে সানী, খাজা নক্শবন্দ, সুলতানুল হিন্দ, মৃত্যু-সংকট, অভিযাত্রিকের প্রার্থনা, মুক্তধারা ও ইশারা।[১১]

সৈয়দ আলী আহসান বলেন-''সিরাজম মুনীরা' কাব্যগ্রন্থে একটি সু-স্পষ্ঠ এবং পরিশীলিত কন্যাণধর্মী জীবনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। তবে এ গ্রন্থের কিছু কবিতায় কিছু সূফী সাধকের কথা এসেছ যেগুলো সিরাজাম মুনীরা' অথবা খেলাফায়ে রাশোদীনের কবিতাগুলোর সাথে ঠিক খাপ খায় না।[১২] এই কাব্যগ্রন্থের দুটি অংশ। প্রথম অংশের নাম 'সিরাজাম মুনীরা মুহাম্মদ মুস্তফা' এবং দ্বিতীয় অংশের নাম 'খোলাফায়ে রোশেদীন'। প্রথম অংশে মুহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাব থেকে তাঁর প্রভাবের কাল বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। হযরতের আবির্ভাব কাল সম্পর্কে কবি বলেন।

''পূর্বাচলের দিগন্ত-নীলে সে জাগে শাহানশাহের মত
তার স্বাক্ষর বাতাসের আগে ওড়ে নীলাভ্রে অনবরত।''

হযরতের আগমনের বর্ণনায় কবি বলেন:

''কে আসে, কে আসে সাড়া পড়ে যায়,
কে আসে, কে আসে নতুন সাড়া।
সাগে সুযুপ্ত মৃত জনপদ, জাগে শতাব্দী-ঘুমের পাড়া।''[১২]

এই কাব্যগ্রন্থটি কবি তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু পীর মরহুম অধ্যাপক আব্দুল খালেককে উৎসর্গ করেন।[১৩] সিরাজাম মুনীরা কাব্যগ্রন্থ মূল্যায়নে বিশিষ্ট কবি সমালোচক আব্দুল মান্নান সৈয়দ বলেন: ''সাত সাগরের মাঝিতে যা ছিল রূপকীকৃত ও প্রতীকী যেন তারই বাস্তব পৃষ্ঠপট রচিত হলো 'সিরাজাম মুনীরা'য়। 'সাত সাগরের মাঝিতে যা ছিল রোমান্টিক। যেন তাঁরই ইতিহাস ভূমি দেখা দিল 'সিরাজম মুনীরায়।' এই গ্রন্থে কবিকে ইসলামিক চিন্তায় গভীর নিবিষ্ঠ চিত্ত দেখা যায়। তাঁর কবি সত্তার শৈল্পিক প্রকাশ এ গ্রন্থে সার্থকতা লাভ করেছে।

ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা : প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৭৫। সম্পাদক: আব্দুল মান্নান সৈয়দ। প্রকাশক: মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। মুদ্রক: বাংলা একাডেমীর মুদ্রণ বিভাগ। প্রচ্ছদ পরিকল্পক: ফজল শাহাবুদ্দিন।[১৪]

হে বন্য স্বপ্নেরা (১৯৭৬) : ফররুখ আহমদের মৃত্যুর দু'বছর পর ১৯৭৬ সালের ১৯ অক্টোবর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সম্পাদিত পাঞ্জেরী নামক সাময়িকপত্রে সর্বপ্রথম 'হে বন্য স্বপ্নেবা' কাব্যটি প্রকাশিত হয়। এরপর একই বছর নভেম্বর মাসে ৪৯টি কবিতা নিয়ে বইটি আত্মপ্রকাশ করে। এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত কবিতাগুলো কবির প্রাথমিক রচনা বলে অনেক গবেষক ধারনা করেন। ১৯৩৪-১৯৪৭ সালের মধ্যে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাগুলোর সমষ্ঠিই এ কাবগ্রন্থ। এই কাব্যগ্রন্থে মোট ৮২টি কবিতা স্থান পেয়েছে।

বিষয়বস্তু ও উপাদানগত দিক বিবেচনা করে 'হে বন্য স্বপ্নেরা' কাব্যের অন্তর্ভূক্ত কবিতাগুলোকে মোটামোটি তিন ভাগে ভাগ করা চলে:

১) নিসর্গ চেতনামূলক
২) প্রেম ও হৃদয়ানুভূতিমূলক এবং
৩) জীবন-বাস্তবতা ও আদর্শ চেতনামূলক

এতে কবির বিদ্রেহী কবিসত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ কবি প্রথম জীবনে বামপন্থি চিন্তাধারার সাথে যুক্ত ছিলেন। এই গ্রন্থের কয়েকটি কবিতায় তা বেশ স্পষ্ঠ। সামগ্রিক বিবেচনায় 'হে বন্য স্বপ্নেরা' কাব্যগ্রন্থটি কবি জীবনের প্রাথমিক প্রয়াস হওয়া সত্বেও এটি তাঁর এক সামর্থক কাব্য হিসাবে অনায়াসে গণ্য হতে পারে। এ কাব্যের মধ্যেই কবির ভবিষ্যৎ সম্ভবনার সুস্পষ্ঠ ইঙ্গিত বিদ্যমান। কিছুটা ভিন্ন স্বাদের হওয়ার কারণে এতে ফররুখ আহমদের কবি প্রতিভার বৈচিত্র সম্পর্কেও অবহিত হওয়ায় যায়।[১৮]

কাফেলা : কবি ফররুখ আহমদের তত্বাবধানে ছয়টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং আরো আটটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু নানা কারণে তা কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি। তন্মধ্যে একটি কাফেলা।[১৯] ১৯৮০ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কবির এই কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ করে।[২০] এই কাব্যগ্রন্থে মোট ৩৩টি কবিতা স্থান পেয়েছে। সেগুলো হলো: কাফেলা, কাফেলা ও মন্‌জিল, তায়েফের পথে, মদিনার মুসাফির, খলিফাতুল মুসলেমিন, এজিদের ছবি, বেলাল, আলমগীর, কোন বিয়াবানে, নতুন সফর, নতুন মিনার, চতুর্দশপদী, দুই মৃত্যু, হে আত্মবিস্মৃত সূর্য, জাগো সূর্য প্রদীপ্ত গৌরবে, বৈশাখ, ঝড়, বর্ষার পদ্মা, আরিচা পারঘাটে, দ্বীপ নির্মাণ, সৃষ্টির গান, স্বর্ণ ঈগল, ইনকিলাব, কিসসাখানির বাজার, পুঁথির কাহিনী অবলম্বনে, ঈদের স্বপ্ন, ঈদের কবিতা, নয়া সড়ক, শেরে বাংলার মাজারে, শিকল, বিরান সড়কের গান, ইবলিশ ও বনি আদম।[২১] ফররুখ গবেষক মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ 'কাফেলা' কাব্যের অর্ন্তগত কবিতা সমূহকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।

১) মুসলিম ইতিহাস-পুরান, ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যভিত্তিক কবিতা এবং
২) স্বদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ, নৈসর্গিক সৌন্দর্য-মহিমা, মাটি মানুষ কেন্দ্রিক কবিতা।[২২]

এই কাব্যগ্রন্থ পাঠ করলে কবির কাব্য দক্ষতার যেমন পরিচয় পাওয়া যায় তেমন কবি মানসের বিবর্তন ও সুস্পষ্ঠ হয়ে ওঠে। ফররুখ আহমদ ঐতিহ্য-চেতনাসম্পন্ন ইসলামী পুনর্জাগরণের কবি হিসাবে সমাধিক পরিচিত। এ কাব্যের অধিকাংশ কবিতার মধ্যেই সে পরিচয় সুস্পষ্ঠ।

হাবেদা মরুর কাহিনী (১৯৮১) : ফররুখ আহমদের একমাত্র এই কাব্যটিই গদ্যছন্দে রচিত। এটি রচিত হবার তেইশ বছর পর (তাঁর ইন্তেকালের সাত বছর পর) প্রকাশিত হয়। ১৯৮১ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ করে।[২৩] এই কাব্যগ্রন্থে মোট ঊনপঞ্চাশটি গদ্য-কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবিতার কোন শিরোনাম নেই সংখ্যা দিয়ে কবিতার পরিচয় চিহ্নিত হয়েছে। পঞ্চাশের দশকে সমসাময়িক সমাজের দুর্নীত, অব্যবস্থাপনা, হতাশা, নৈরাজ্য তাঁর মনে যে গভীর বেদনা সৃষ্টি করেছিল তারই কাব্যিক অভিব্যক্তি ঘটেছে এ গ্রন্থটিতে।[২৪] তৎকালীন সময়ে দেশের বিদ্যমান দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি এই গ্রন্থের প্রথমেই রূপকের আশ্রয় নিয়ে বলেন:

জুলমাতের হিংস্র ছায়ায়
মিশে গেছে কাহিনী শোনার সন্ধ্যা.....
কিন্তু এখানে,
এখানে এই আমিল ছন্দহীন প্রাণের পৃথবীতে,
কাকর-বিছানো মাঠে,
বালুর-রক্ষু বিয়াবানে
আমাদের দিন কেটে যায়
হাবেদা মরুর মাঠের
বাতাসের দীর্ঘশ্বাস শুনে
যে বাতাসে মিশে আছে
অসংখ্য বঞ্চিত প্রাণের আকুতি,
যে বাতাসে মিশে আছে
বেশুমার ইনসানের আহজারি,
যে বাতাসে মিশে আছে
সেই বৃদ্ধ জয়ীফের কণ্ঠ
আর অভিযাত্রী কাফেলার
বহু ব্যর্থতার কাহিনী
(যা শুধু আমরা কানেই শুনেছি
দেখিনি কখনো দু চোখে)[২৫]

সর্বোপরি এই কাব্যে কবির গভীর দেশপ্রেম, দেশের কল্যাণ কামনা, মানুষের দুর্দশা লাঘব ও মানব কল্যাণকামিতার মহত্তম দিকের প্রকাশ ঘটেছে।

সনেট

মুহূর্তের কবিতা (১৯৬৩), দিলরুবা (১৯৯৪), অনুস্বর (ব্যঙ্গ কবিতা)[২৬]

মুহূর্তের কবিতা : যে ক'জন কবি চল্লিশের দশকে বাংলা সাহিত্যে অসাধরণ শক্তি ও বিশেষ প্রতিভা নিয়ে আগমন করেছিলেন ফররুখ আহমদ তাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর এক উজ্জ্বল কাব্যগ্রন্থ 'মুহূর্তের কবিতা।' ১০১টি সনেট নিয়ে এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে। ১৮ মাত্রার সনেটগুলিতে তাঁর আদর্শ জীবনবোধ,

বিষয়-বৈচিত্র দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা ও অসামান্যতা ফুটে উঠেছে। সংকলিত সনেটগুলো বিষয় অনুসারে নিম্ন লিখিতভাবে ভাগ করা যায়।

১) কবিতা ও সনেট, ২) প্রকৃতি, ৩) মধ্য প্রাচ্যের কবি, ৪) পুঁথি সাহিত্য, ৫) লোক সাহিত্য, ৬) ইতিহাস, ৭) তারা, ৮) শহর, ৯) পাখি, ১০) স্বপ্ন ও জাগরণ।[২৭]

কবি সনেটকে বলেছেন মুহূর্তের কবিতা। সনেট রচনার সংখ্যা এবং স্বার্থকর্তার দিকে থেকে মুধুসূদনের পর ফররুখ আহমেদকেই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সনেট রচয়িতা হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁর রচিত সনেটের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিনশত। সনেট রচনার সংখ্যা এবং গুনগত মানের দিক থেকে ফররুখ আহমদ বাংলা সাহিত্যে সনেটিয়ার হিসেবে অসাধারণ সাফল্যের অধিকারী। তাই এক্ষেত্রে ফররুখ আহমদের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।[২৮]

দিলরুবা (১৯৯৪) : এই কাব্যগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। প্রকাশক ছিলেন চট্টগ্রাম সংস্কৃতি কেন্দ্রের পক্ষে অমিরুল ইসলাম। এর ভূমিকা লেখেন আব্দুল মান্নান সৈয়দ।[২৯] 'দিলরুবা' প্রেমের কবিতা। কবিতাগুলো সনেট আকারে লেখা। সনেটগুচ্ছের মূল বিষয় প্রেম এবং তার মধ্যে আরব্য উপন্যাসের ইঙ্গিত আছে। কবির জীবিত অবস্থায় এই কবিতাগুলো পুস্তক আকারে ছাপা হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর আব্দুল মান্নান সৈয়দের সম্পাদনায় কবিতাগুলো ছাপা হয়।[৩০] সৈয়দ আলী আহসান বলেন ''ফররুখ যে আরব্য উপন্যাসের প্রেমকে অবলম্ব করে এই কাব্য রচনা করেছেন তাঁর সাক্ষী আমি নিজে। তবে এতে আরব্য উপন্যাসের কোন কাহিনী নেই অথবা বিশেষ কোন চরিত্রের অভিব্যক্তি নেই। শুধুমাত্র প্রেমের যে রসাবেশ তাঁকে অবলম্বন করে এবং তা দিয়ে তিনি 'দিলরুবার'র সনেটগুলো সাজিয়েছেন।''[৩১]

অনুস্বর (বঙ্গ কবিতা) : কবি তাঁর জীদ্দসায় 'অনুস্বর' নামের একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা করেছিলেন। তাতে ৯২টি কবিতার শিরোনাম ছিল। যে কোন কারণে সেটি তাঁর জীবতকালে প্রকাশিত হয়নি। কবিতাগুলো ১৯৪৪-৪৬ সালের মধ্যে লেখা। কবির ইন্তেকালের পরে আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত ফররুখ রচনাবলী (প্রথম খন্ড) তে মোট ৮৪টি কবিতা মুদ্রিত হয়েছে। এ সব কবিতায় কবি হাস্য-রসাত্মক ভঙ্গিতে সমাজের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি স্খলন-পতন ও দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ব্যক্তি-মানুষ ও সমাজের বিভিন্ন অবক্ষয় বিচ্যুতি ও অন্যায় অনাচারের বিরুদ্ধে তাঁর কবিতা চাবুকের ন্যায় কষাঘাত হেনেছে। এই কাব্য ফররুখ আহমদের সমাজমনস্কতার পরিচয় গভীরভাবে ফুটে উঠেছে। এই কাব্যের বিশেষ বৈশিষ্ট হলো এটি সনেট আকারে রচিত। এক্ষেত্রে কবির অবদান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত।[৩২]

গান

রক্ত গোলাব, কাব্যগীতি, মাহফিল (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড ১৯৮৭)

মাহফিল (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড) : কবির একক গানের বই মাহফিল ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয়। এটি প্রকাশ করে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা বিভাগ। দীর্ঘদিন পর ফেব্রুয়ারী ২০০৪-এ এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের প্রথম খন্ডে ৫টি বিভাগ। বিভাগগুলো হলো হামদ, নাত, নামাজ, জুমা ও মুহাররাম। হামদ বিভাগ ৩১টি হামদ, নাত বিভাগ ১২টি নাত, নামাজ অংশে ৫টি, জুমা অংশে ৪টি ও মুহাররাম অংশে ৬টি গজল মুদ্রিত হয়েছে। দ্বিতীয় খন্ডের প্রথম ভাগে রবিউল আউয়াল, ঈদ মিলাদুন্নবী বিষয়ক গজলসহ অন্যান্য ৩৩টি ইসলামী গান এবং দ্বিতীয় ভাগে ৩৫টি দোয়া ও মুনাজাত স্থান পেছে। গ্রন্থে মুদ্রিত গানের সর্বমোট সংখ্যা ১২৬টি।[৩৩]

মহাকাব্য

হাতেম তা'য়ী (১৯৬৬) : 'হাতেম তা'য়ী' কবি ফররুখ আহমদের একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে। প্রকাশক: বাংলা একাডেমী বর্ধমান হাউস, ঢাকা।[৩৪] 'হাতেম তা'য়ী' কাব্যটি দুই খন্ডে বিভক্ত, সূচনা খন্ড ও শেষ খন্ড। সূচনা খন্ড মোট সাত অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়গুলো হলো পহেলা সওয়াল, দুস্‌রা সওয়াল, তিস্‌রা সওয়াল, চাহারাম সওয়াল, পঞ্চম সওয়াল, শশম সওয়াল ও আখেরী সওয়াল। শেষ খন্ড মূলত কাব্যের উপসংহার হিসেবে বিবেচিত।[৩৫] এ কাব্যের পরিকল্পনায় ফররুখ আহমদ মধ্যযুগের পুঁথি সাহিত্যের ধারাকে অবলম্ব করার প্রয়াস পেয়েছেন। কবি তাঁর এ কাব্যে সৈয়দ হামজার 'হাতেম তা'য়ী কাব্যের কাহিনী অবলম্বন করেছেন।[৩৬] 'হাতেম তা'য়ী' কাব্যে ছন্দ ব্যবহার সম্পর্কে ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বলেন: ''হাতেম তা'য়ী কাব্যে কবি অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত-তিন রকম ছন্দই ব্যবহার করেছেন। তবে অক্ষরবৃত্তের ব্যবহারই প্রধান।''[৩৭] সৈয়দ আলী আহসান বলেন-'' ফররুখ আহমদ পুঁথিকে কিন্তু অনুসরণ করেন নি, না পুঁথির ভাষা না পুঁথির জীবনদর্শন। সে হাতেম তা'য়ী কে বেছে নিয়েছে প্রভাবান মানুষ হিসেবে যিনি সর্বদা উন্মুখ মানব সেবার জন্য।''[৩৮] এই কাব্য মূল্যায়নে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বলেন ''হাতেম তা'য়ী' কবি ফররুখ আহমদের কাব্যাদর্শের শ্রেষ্ঠ ফসল এবং এ কাব্যে কবির প্রতিভা পরিণতি লাভ করেছে।''[৩৯] পরিশষে বলা যায় তাঁর এ সাফল্যের কীর্তি-গাঁথা রচনায় 'হাতেম তা'য়ী' কাব্য এক উজ্জ্বল মাইল-ফলক হিসেবে চিহ্নিত।

কাব্যনাট্য

নৌফেল ও হামে (১৯১৬১) : এটি প্রথম প্রকাশিত হয় জুন ১৯৬১ সালে। কাব্য নাটকটি তিন খন্ডে এবং ৫,৪ ও ৫ মোট চৌদ্দটি দৃশ্যে বিভক্ত।[৪০] ফররুখ আহমদ ইতিহাসের বিষয়বস্তু অবলম্বনে এটি রচনা করেছেন। এতে অতিমানবীয় কোন বিষয়ের অবতারণা করা হয়নি। এর কাহিনী ও বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ জাগতিক ও রসে পূর্ণ। নাটকীয় কাহিনী ঘটনা ও চরিত্র স্থাপনের ক্ষেত্রে তাঁর পারদর্শিতা প্রশংসাযোগ্য। এটি বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন। কাব্যনাট্য হিসেবে এর উৎকর্ষ ও সাফল্য সম্পর্কে অধিকাংশ সমালোচকই নৃঃসংশয় অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সর্বোপরি এটা একটা মঞ্চ-সফল কাব্যনাট্য হিসাবে সর্বজন প্রশংসিত। তাই বাংলা সাহিত্যে এটা এক মূল্যবান সংযোজন।[৪১]

গীতিনাট্য

আনারকলি (১৯৬৬) : ফররুখ আহমদ রচিত 'আনারকলি' গীতিনাট্যটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'পাকিস্তানী খবর' পত্রিকায় ৯ এপ্রিল ১৯৬৬সালে। এটা ৯ পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ, এতে মোট তিনটি দৃশ্য রয়েছে। মুঘল সম্রাট আকবরের পুত্র সেলিম ও ইরানের শাজহাদী আনারকলির অসাধারণ প্রেম কাহিনী ও সে প্রমের করুণ পরিণতি নিয়ে নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে। এতে মোট তিনটি দৃশ্যে ১১ জন চরিত্রের বর্ণনা রয়েছে।[৪২] 'আনারকলি' গীতিনাট্যে ফররুখ আহমদের কাব্য প্রতিভার এক বিশেষ দিকের উন্মোচন ঘটেছে। এটি তাঁর একমাত্র গীতিনাট্য হলেও বিশেষভাবে সফল, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

গদ্য ব্যঙ্গ নাটিকা

রাজ'-রাজরা' (১৯৪৮) : 'রাজ-রাজড়া' ব্যঙ্গ নাটকটি ১৯৫০-এর দশকে রচিত হলেও এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ সালে বেনজীর আহমদ ও আবু জাফর শামসুদ্দীন সম্পাদিত 'নয়া সড়ক' সংকলনে।[৪৩] এই নাটকটি সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর রফিকুল ইসলাম বলেন ''ফররুখ ভাই পাকিস্তান ইসলামী আদর্শের অনুরাগী ও অনুসারী বরাবর, কিন্তু তদানীন্তন পাকিস্তানি ও পূর্ব পাকিস্তানি শাসকেরা ইসলামের নামে যা করছিলেন, তাতে তাঁদের ওপরে সবচেয়ে বেশি ক্রুদ্ধ ছিলেন ফররুখ ভাই। তিনি ঐ শাসকদের ব্যঙ্গ করে 'রাজরাজড়া' নামে একটি নাটক লিখেছিলেন এবং তা বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিনীত হয়েছিল।[৪৪] জীবদ্দশায় এটি বহুবার মঞ্চায়িত হয়েছে এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।[৪৫] বর্তমানেও এর প্রাসঙ্গিকতা সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন রয়েছে। তাই এটি একটি স্বার্থক নাটক হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

ব্যঙ্গ কবিতা

ধোলাই কাব্য (ফারুক মাহমুদ সম্পাদিত-১৯৬৩), বিসর্গ (রচনাকাল ১৯৪৬-৪৮), ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক কাব্য (১৯৯১), হালকা লেখা, তসবিরনামা, বসরঙ্গ[৪৬]

অনুবাদ কাব্য

ইকবালের নির্বাচিত কবিতা (১৯৮০) কুরআন মঞ্জুষা, আমপরা, (কুরআন শরিফের ২৯টি সূরার অনুবাদ।[৪৭]

ছোট গল্প

ফররুক আহমদের গল্প (১৯৯০) : ফররুখ আহমদের মৃত্যুর সুদীর্ঘকাল পরে প্রখ্যাত কবি, সাহিত্য সমালোচক আব্দুল মান্নান সৈয়দের সুদক্ষ সম্পাদনায় এবং ঢাকার সৃজনী প্রকাশনী লিমিটেড'এর উদ্যোগে ১৯৯০ সালের জানুয়রি মাসে 'ফররুখ আহমদের গল্প' শিরোনামে তাঁর একটি গল্প-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে মোট ৫টি গল্প সন্নিবেশিত হয়েছে। সেগুলো হলো:- (১) মৃতবসুধা, (২) 'বিবর্ণ', (৩) 'অন্তর্লীন', (৪) 'যে পুতুল ডলির মা', (৫) 'প্রচ্ছন্ন নায়িকা।[৪৮]

তাঁর পাঁচটি গল্পই শিল্পোত্তীর্ণ এবং সৃজনশীল দক্ষতার পরিচায়ক।

উপন্যাস

সিকান্দর শা'র ঘোড়া (একটি অসম্পূর্ণ উপন্যাস)

শিশুতোষ কাব্য

পাখির বাসা (১৯৬৫) হরফের ছড়া (১৯৬৮), নতুন লেখা (১৯৬৯), ছড়ার আসন-১ (১৯৭০), চিড়িয়াখানা (১৯৮০), ফুলের জসলা (১৯৮৫), হালক্সা লেখা, ছড়ার আসর-২, ছড়ার আসর-৩, সাঝ সকালের কিস্‌সা, আলোকলতা, খুশির ছড়া, মজার ছড়া, পাখির ছড়া, রং মশাল, জোড় হরাফের ছড়া, পড়ার শুরু, পোকামাকড়।[৪৯] ফররুখ আহমদের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের তুলনায় শিশু-কিশোর ছড়া-কবিতার উপর খুব কম আলোচনা হয়েছে। তাঁর রচিত শিশু-কিশোর কাব্যের সংখ্যা মোট ২১টি। এ ছাড়া তিনি স্কুল পাঠ্য হিসেবে ৪টি গ্রন্থ রচনা করেছেন।[৫০] সেগুলো হলো- (১) নয়া জামাত (প্রথম ভাগ-১৯৫০), (২) নয়া জামাত (দ্বিতীয় ভাগ-১৯৫০), (৩) নয়া জামাত (তৃতীয় ভাগ-১৯৫০), (৪) নয়া জামাত (চতুর্থ ভাগ-১৯৫০)।[৫১] এভাবে দেখা যায় ফররুখ আহমদ শিশুদের জন্য অসংখ্যা ছড়া-কবিতা রচনা করেছেন। এগুলো বিষয়বস্তুর দিক থেকে যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ তেমনি মন-মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে শিশু-কিশোরদের সম্পূর্ণ

উপযোগী। তাই বলা যায় বাংলা শিশু সাহিত্যে ফররুখ আহমদের অবদান যেমন ব্যাপক তেমনি গুনগত মানের বিচারে অসাধারণ।

ফররুখ আহদ প্রায় ৫০টি গ্রন্থের রচিয়তা। তাঁর জীবদ্দশাতে অল্প কয়টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর পর তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও এখনো কিছু পান্ডলিপি বিদ্যমান আছে যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।[৫২]

উপসংহার

ফররুখ আহমদের সমগ্র রচনাবলি পর্যালোচনা করলে তাঁর প্রতিভার বিশালত্ব তাঁর রচনার বৈচিত্র্য ও বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা সহজেই চোখে পড়ে। তিনি তাঁর ভাব-ভাষা-ব্যঞ্জনা ও আবদনের দিক দিয়ে কাব্যের এক মহীয়ান, দীপ্তিমান, স্বতন্ত্র ভুবন নির্মাণে সক্ষম হয়েছে। কবি হিসাবে এটা তাঁর এক উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য।

তথ্যসূত্র

১. মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য*, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০২), পৃ.১৫০।

২. *ফররুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য*, মুহাম্মদ মতিউর রহমান-সম্পাদিত, পৃ. ৫৪৩।

৩. অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ আহমদের সাত সাগরের মাঝি*, পৃ. ৭৮।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ.১৯।

৫. অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ প্রতিভা*, পৃ.৬১।

৬. অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ আহমদের সাত সাগরের মাঝি*, পৃ.১৫-২০।

৬. ক) *ফররুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য*, মুহাম্মদ মতিউর রহমান-সম্পাদিত, পৃ.৪৬৫।

৭. অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ প্রতিভা*, পৃ. ২৪৫।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬।

১২. সৈয়দ আলী আহসান, *ফররুখ আহমদের সিরাজাম মুনীরা*, ভূমিকা।

১৩. অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ প্রতিভা*, পৃ. ২৭৩-২৭৪।

১৪. অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ প্রতিভা*, পৃ- ২৫৭।

১৫. অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ প্রতিভা*, পৃ- ২৫৯।

১৬. অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ প্রতিভা*, পৃ- ২৫৯।

১৭. অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ প্রতিভা*, পৃ.৬৩।

১৮. প্রাগুক্ত, প্র. ১৬৮-১৮৯।

১৯. প্রাগুক্ত, প্র.২৯৬।

২০. *ফররুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য*, মুহাম্মদ মতিউর রহমান-সম্পাদিত, পৃ. ৪১৭।

২১. অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ প্রতিভা*, পৃ. ২৯৭।

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭।

২৩. *ফররুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য*, মুহাম্মদ মতিউর রহমান সম্পাদিত, পৃ. ১৫০।

২৪. অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ প্রতিভা*, পৃ. ৪৪৯।

২৫. *ফররুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য*, মুহাম্মদ মতিউর রহমান সম্পাদিত, পৃ. ১৫৩।

২৬. অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ আহমদের সাত সাগরের মাঝি*, পৃ. ৭৭।

২৭. ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *ফররুখ আহমদের 'মুহূর্তের কবিতা'*, ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর, ২০০১।

২৮. অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ প্রতিভা*, পৃ. ৩৬৯।

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ.৬৫।

৩০. *ফররুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য*, মুহাম্মদ মতিউর রহমান-সম্পাদিত, পৃ. ৮২।

৩১. সৈয়দ আলী আহসান, *ফররুখ আহমদের 'দিলরুবা'*, ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর, ২০০১।

৩২. অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ প্রতিভা*, পৃ. ৪৬৩-৪৭৪।

৩৩. মুকুল চৌধুরী, *ফররুখ আহমদের ইসলামী গান-গজল*, ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ২২তম সংখ্যা ফেব্রুয়ারী ২০১২।

৩৪. অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ প্রতিভা*, পৃ. ৪০৬।

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৬।

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১১-৪১২।

৩৭. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *'মাহে-নও'*, ১৯৬৬, পৃ. ৪২০।

৩৮. সৈয়দ আলী আহসান, *ফররুখ আহমদ-এর 'হাতেম তায়ী'* ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ৫ম সংখ্যা, জুন ২০০২।

৩৯. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *'মাহে-নও'*, ১৯৬৬।

৪০. অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ প্রতিভা*, পৃ. ৩৭৩।

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৩-৩৮৫।

৪২. *ফররুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য*, মুহাম্মদ মতিউর রহমান-সম্পাদিত, পৃ. ৩৭৪।

৪৩. *ফররুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য*, মুহাম্মদ মতিউর রহমান সম্পাদিত, পৃ. ১৪৩।

৪৪. অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ প্রতিভা*, পৃ. ৩৯২।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯।

৪৬. অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ আহমদের সাত সাগরের মাঝি*, পৃ. ৭৭।

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

৪৮. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, *ফররুখ আহমদের গল্প : তাঁর সৃজনশীলতার স্বরুপ*, ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ১২তম সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৫।

৪৯. অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ আহমদের সাত সাগরের মাঝি*, পৃ. ৭৮।

৫০. অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ প্রতিভা*, পৃ. ৪৭৪।

৫১. অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ আহমদের সাত সাগরের মাঝি*, পৃ. ৭৮।

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

গ)

‘দিওয়ানু মাজদিল ইসলাম’ এবং ‘সাত সাগরের মাঝি’ ও সিরাজম মুনীরা’ কাব্যত্রয়ের’ উপর আলোচনা

ক) দিওয়ানু মাজদিল ইসলাম

দিওয়ানু মাজদিল ইসলাম কাব্যের পটভূমি :

একজন সাহিত্যিকের মাঝে সাহিত্য সাধনার মৌলিক যোগ্যতা প্রকৃতিগত ভাবেই পরিস্ফুট হয়। এখানে অর্জনের চেয়ে প্রকৃতির দানই মুখ্য। তবে খোদা প্রদত্ত মেধার যথার্থ ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। আহমাদ মুহাররাম প্রকৃতগত ভাবেই প্রতিভাবান ছিলেন। বাল্যকাল হতেই তিনি কবিতা চর্চা করেন এবং এক্ষেত্রে সুউচ্চ অবস্থানে পৌঁছতে সামর্থ্য হন।[১]

তিনি ছিলেন সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী। জীবন উপকরণ উপভোগে তিনি অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করতেন।[২] তাইতো তাঁর সাহিত্যকর্ম পরিচ্ছন্ন ও ইসলামী ভাবধারায় সিক্ত। আরবী ও বিশ্ব সাহিত্যে একটা স্বতন্ত্র ইসলামী ধারা সৃষ্টির যে সচেতন প্রয়াস আজ পরিলক্ষিত হচ্ছে, আরব বিশ্বে তিনি তার অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর কবিতার মূলভাবই হল ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহত্ব। তাইতো তিনি চার খন্ডে 'দিওয়ানু মাজদিল ইসলাম' নামক একটি মহাকাব্য রচনা করেছেন। এটি ১৯৬৩ সালে আল-ইলইয়াজাহ্ আল-ইসলামিয়্যাহ বা দিওয়ানু মাজদিল ইসলাম নামে প্রকাশিত হয়।[৩] তার এই বিখ্যাত গ্রন্থ রচনার পটভূমি স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার দাবী রাখে।

সর্বপ্রথম উস্তাদ মুহিববুদ্দিন আল-খাতিবের চিন্তায় ''ইসলামের গৌরব ও আবরত্বের সমমান'' সম্বলিত রচনার তাগিত অনুভূত হয়। আর এজন্য তিনি উপযুক্ত সাহিত্যেকের অনুসন্ধান করতে লাগলেন। অবশেষে ২৫ রবিউল আওয়াল ১৯৫৩ হিজরী সনে তিনি আহমাদ মুহাররামের নিকট একটি চিঠি প্রেরণ করেন এবং তাতে ''ইসলামের গৌরব ও আরবত্বের সমমান'' সম্বলিত দিওয়ান রচনার প্রস্তাব পেশ করেন। উক্ত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আহমাদ মুহাররাম তাঁর মৃত্যুর ১০ বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৩৫৩ হিজরী সনে এটি রচনা করেন। তাঁর মৃত্যুর ২০ বছর পর ১৮৮৩ সালে এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়।[৪] উক্ত চিঠিটি নিম্নরুপ:

মহামান্য উস্তাদ আরবী ভাষার গর্ব ও মহান মিশরীয় কবি আহমাদ মুহাররাম :

আপনার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। জিহাদী তৎপরতায় কিছু সময় অতিবাহিত করা এবং স্বীয় বক্ষকে এ কাজে উন্মুক্ত করা দেওয়া আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রমাণ হিসেবে বিবেচ্য। আর এমন অনেক একক যোদ্ধা আছে যিনি হাজার যোদ্ধার চেয়ে উত্তম।

অতএব, আমি অনেকবার ইচ্ছা পোষণ করেছি যে, আপনার কাছে চিঠি লিখব এবং আপনার সমীপে তুলে ধরব একটি প্রস্তাব। সাথে সাথে উক্ত প্রস্তাব বাস্তবায়নে আমরা সম্মিলিত ভাবে আহমাদ শাওকী বেগমকেও

সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করব। কিন্তু আমি ভয় করছি যে, জিহাদের ভিন্ন কোন অর্থ আপনাদেরকে এই প্রস্তাব থেকে ফিরিয়ে রাখব।

প্রস্তাবটি হলোঃ আপনার সুচিন্তিত দৃষ্টি ভঙ্গির আলোকে ইসলামের গৌরবময় ইতিহাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনীতি, আত্মশুদ্ধি, যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদি বিষয় এক একটি কাব্য রচনা করবেন যা যুবকদের অন্তরে স্থায়ী ছাপ ফেলতে সক্ষম হবে। অতঃপর বিভিন্ন ছন্দ ও অন্ত্যমিল যুক্ত ঐ সকল কবিতা লেখা সম্পন্ন হলে ঘটনার ধারাবাহিকতায় আমরা সে গুলোকে বিন্যস্ত করতে সক্ষম হব। ফলে সমগ্র রচনা সমষ্ঠি একটি ইসলামী মহাকাব্য হিসেবে রূপ লাভ করবে।

এটা কি আমাদের জন্য অপমান কর নয় যে, পারস্য জাতির রয়েছে মহাকাব্য। যার নাম 'শাহনামা'। যাতে তারা তাদের অতীত ইতিহাসকে সংরক্ষণ করেছে। তাতে গচ্ছিত রেখেছে তাদের জ্যোর্তিময় প্রাচীন ঘটনাবলী। গ্রীক জাতির রয়েছে অতিপ্রাচীন কাল থেকে গৌরবের দিওয়ান ''ইলিয়ড'' যা মানুষ গানের সুরে পাঠ করে থাকে।

আর ইসলাম যা মানুষের মর্যদাকে সমুন্নত করেছে অথচ ইসলামের ইতিহাস রচনা করার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকগন ইতিহাসকে শুধু বিকৃত-ই করিনি বরং তাচ্ছিল্ল ভাবে উপস্থাপন করেছে। কেননা ইসলামের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যারা কলম চালিয়েছেন তারা দুই শ্রেণী লোকের কোন এক শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। প্রথমত ঐ ব্যক্তি যিনি কোন রাষ্ট্রের পতনের পর নতুন অপর কোন রাষ্ট্রে আগমন করে তার অধিবাসিদের কাছে পুরাতন রাষ্ট্রের ভাল দিকগুলোকে বিকৃত রূপে উপস্থাপন করেছে। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যিনি চারটি সূর্য তথা আবু বকর (রা.), ওমর (রা.), উসমান (রা.) ও আলী (রা.) কে সুউচ্চ মর্যাদাবান হিসেবে গ্রহণ করেছে। ফলে আরবদের চন্দ্র সমূহ হতে অন্য সকল চন্দ্রই তারকাছে নিন্দিত, পথভ্রষ্ট ও ত্রুটির বিশেষণে বিশেষিত হয়েছে। কেননা সে মনুষত্ব্যের উর্ধ্বে অবস্থিত ঐ সূর্য সমূহের আলোর দ্বারাই অন্যদেরকে যাচাই করে। সাধারণ মানুষের প্রতিভাকে অপর মানুষের প্রতিভার সাথে তুলনা করা হয় না। বরং উসমান (রা.) যার ত্যাগ ও নিস্কলুষ চরিত্র থাকা সত্ত্বেও ঐতিহাসিকদের বৃকত বিবরণের কারণে মানুষের মস্তিষ্ক থেকে তাঁর মর্যাদা মুছে গেছে। মুয়াবিয়া (রা.) শ্রেষ্ঠ জাতি সমূহের মধ্য হতে এমন এক ব্যক্তি যিনি দশগুন মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠেত্বের অধিকারী তারপরেও আমরা তার ব্যাপারে শুনতে পাব নিকৃষ্ট ব্যক্তির চেয়ে মন্দ কথা। আমীন যাকে তার সমসাময়িক কালে কুরাইশদের সর্বোৎকৃষ্ঠ সুস্পষ্টভাষী হিসেবে গণ্য করা হত, তাকেও ঐতিহাসিকরা মানুষের সামনে নিকৃষ্ট আকৃতিতে চিত্রিত করেছে।

আর ইয়াজিদ যিনি ঐ সকল বিশিষ্ট সাহাবীদের নেতা ছিলেন যারা স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে তার নেতৃত্বে জিহাদ করেছে অথচ তার (ইয়াজিদ) উপর মিথ্যার প্রলেপ দেওয়া হয়েছে।

আমি আলী সমার্থক হয়েও একথা বলছি-আমি মুসলমানদের মর্যাদার প্রাসাদকে ভেঙ্গে ফেলা এবং গৌরবের দূর্গকে চুরমার করে দেওয়ার ব্যাপারে আশঙ্কা করছি। যখন আমাদের সন্তানেরা ইউরোপীয়দের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছে এবং তাদের শিল্পকৃতী মানুষের নিকট গৌরবের বস্তু। যদি তাদের প্রকৃত ইতিহাস থেকে পর্দা সরে যেত তাহলে আমরা তার দুর্গন্ধ পেতাম। আমাদের মধ্যেকে আছে যে মাসলামা বিন আব্দুল মালেক কে তার সমসাময়িক হিসেবে চেনে? আর ঐতিহাসিকরা ইসলামের ইতিহাসকে সংকুচিত করে ফেলেছে, যা কেবল কবিরাই উপলব্ধি করতে সক্ষম। অথচ আমাদের অধিকাংশ কবিই মহিলাদের সৌন্দর্য বর্ণনায় ব্যস্ত, তাদের মেধা কল্যাণমূলক বর্ণনা থেকে ফিরানো। তারা ইংরেজ কবিদের দিওয়ান থেকে রচনাশৈলী, বিষয়বস্তু ইত্যাদি চুরি করতে মশগুল। আরব ও ইসলামের ইতিহাস পুন:নিরীক্ষনের সময়টুকু তাদের নেই।

যা হোক, অনেক কথা বললাম, কিন্তু আমি আপনাকে ছাড়া এমন কোন হৃদয়বান ব্যক্তিকে দেখছি না যার সমীপে আনীত করব আমার হৃদয়ে জমে থাকা কথামালা। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে এই কাজের জন্য কবুল করুন। আর তিনি আমাকে এলহাম করেছেন যেন আমি এই পত্রখানা আপনার ঠিকানায় পৌঁছিয়ে দিই।

ওয়াস সালামু আলাইকুম ও রহমাতুল্লাহ।

উক্ত চিঠি হস্তগত হওয়ার পর যখন ঐ সুউচ্চ সাহিত্যিয় ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পথে নির্দেশনা বলী স্পষ্ঠ হয়ে গেল তখন তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ শৈল্পিক সাহিত্যকর্মের সূচনার কথা ঘোষণা করলেন।

তিনি রচনার পথে চলতে লাগলেন। অবশেষে কাব্যে ইসলামী ইতিহাসের এক পরিচ্ছন্ন আকৃতি উপস্থাপন করলেন। যা ছিল শৈল্পীকতায় পরিপূর্ণ সুস্পষ্ট অর্থবহ এবং শক্তিশালী অভিব্যক্তির প্রকাশ। অনন্তর যুবকরা তাদের গৌরবোজ্জল ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দিল। তাদের পূর্ব পুরুষদের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হল। এই রচনার মাধ্যমে তিনি ইসলামী ইতিহাসের সংশয়াপূর্ণ বিষয়গুলিকে যুবকদের নিকট স্পষ্ট করে দিলেন। এক্ষেত্রে আহমাদ মুহাররাম তাঁর সমস্ত শৈল্পীক শক্তিকে একত্রিত করে ইসলামের ইতিহাস রচনায় নিয়োগ করলেন। তিনি ইসলামের ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ তথ্য বের করে আনতে এবং এই গৌরবোজ্জাল ইতিহাসকে হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করতে চাইলেন। অবশেষে উক্ত ইতিহাসকে সুউচ্চ শৈল্পীক পদ্ধতিতে রচনা করলেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, ইসলামী চেতনা ছিলেন তাঁর কাব্য রচনার অন্যতম চালিকা শক্তি। তাইতো তীব্র এই ধর্মীয় চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে সৃষ্টি করেছেন ইসলামী মহাকাব্য ''দিওয়ানু মাজদিল ইসলাম'' যা আরবী কাব্য সাহিত্যের লয় অবধি টিকে থাকবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

গ্রন্থ হিসেবে দিওয়ানু মাজদিল ইসলামের পরিচিতি :

উস্তাদ মুহবিুদ্দীন আল-খাতীবের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আহমাদ মুহাররাম তাঁর মৃত্যুর ১০ বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৩৫৩ হিজরীতে এটি রচনা করেন।তাঁর মৃত্যুর প্রায় ২০ বছর পর ১৩৮৩ হিজরী সালে এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়।[৭] এটি মূলত চার খন্ডের একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ। যার প্রত্যেক খন্ডের শুরুতে দুটি করে বিশেষ পৃষ্ঠা সংযুক্ত করা হয়েছে। যার প্রথমটিতে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করণ আয়াত এবং দ্বিতীয়টিতে জীবন চরি ও এলমে মাগাজি সংক্রান্ত তাবেয়ীদের বাণী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[৮] আহমাদ মুহাররামের এই শ্বাশ্বত সাহিত্য কর্মটি ধারাবাহিক ভাবে 'আল-বালাগ' 'আল-ফাতাহ' ও 'মাজাল্লাতুল আযহার' নামক পত্রিকায় প্রকাশ করতে না করতেই মিশর, সিরিয়া ও ইরাকের লেখকবৃন্দ এটিকে সাদরে গ্রহণ করলেন। লেখক এটি তাঁর জীবদ্দশাতেই সমাপ্ত করেছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর আগে প্রকাশ করতে পারেন নি। হস্তলিপি হিসেবেই অবশিষ্ট ছিলো।[৯] তিনি তীব্রভাবে কামনা করেছিলেন অন্তত ১ম খন্ডটি তাঁর জীবদ্দশাতেই মানুষের হাতে পোঁছে যাক। কিন্তু তা আর সম্ভব হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর এটি প্রকাশিত হয়। সর্বমোট গ্রন্থটি ২ বার প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমত ১৩৮৩ হি:/১৯৬৩ইং সালে দ্বিতীয়ত ১৪০১ হি: সালে।[১০] রাসুল (সাঃ) এর জীবন ভিত্তিক ইসলামী বীরত্বের চিত্রাংকনে আরবীয় কবিদের মাঝে তিনি ছিলেন একক ব্যক্তিত্ব। তিন হাজার শ্লোকে রাসুল (সাঃ) এর জীবন ও জীবন সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী ধারাবাহিক বিবরণ দিয়ে 'ইসলামের সম্মান'' শিরোনামে এক নবুয়তী মহাকাব্য রচনা করেছেন। তিনি প্রতিষ্ঠিত ঘটনাবলী, যুদ্ধ বিগ্রহ ও সিরাত ভিত্তিক একই ওজনে উক্ত মহাকাব্য রচনা করেন যা, কল্পনাপ্রসূত ও ধারনামূলক বক্তব্য হতে সম্পূর্ণ মুক্ত।[১১]আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, গ্রন্থটি মোট চার খন্ডে বিভক্ত।

প্রথম খন্ডঃ এই খন্ডে তিনি রাসুল (সা.) এর মাক্কী জীবন, হিজরত, মাদানী জীবন, মুহাজির ও আনসারদের মাঝে ভাতৃত্ব বন্ধন এবং ইহুদী ও নাছারাদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও এগুলোতে সাহাবা কিরামদের (রা.) বীরত্ব প্রদর্শন এবং আত্মোৎসর্গ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড

এই দুই খন্ডেও এতদ্সংক্রান্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে।[১২]

যেহেতু বর্তমানে গ্রন্থটি একটি খন্ডে সন্নিবেশিত এবং তাতে প্রত্যেক খন্ড পৃথক ভাবে চিহ্নিত না থাকায় ১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড গুলিতে সন্নিবেশিত কবিতাগুলির কিছু শিরোনাম আমি একত্রে গন্থে বিন্যস্ত অনুসারে নিম্নে উল্লেখ করলাম।

1) مطلع النور الأول من أفق الدعوة الإسلامية

2) **المطعم بن عدى**

3)**في غار حراء**

4)**في دار الأرقم بن أبي الأرقم**

5) إرادة قتل الرسول وهجرته إلى المدينة

6)**في الغار الأكبر غار ثور**

7) أبو بكر وحية الغاز

8) سراقة بن مالك يريد قتل الرسول

9) في خيمة أم معبد

10) بريدة بن الحطيب

11)**في قباء**

12) **حى بن عمرو بن عوف**

13) من قبا إلى المدينة

14) جفنة أم زيد بن ثابت

15) المهاجرون في ضيافة الأنصار

16) مسجد المدينة

17) المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار

18) اليهود والمنافقون

19) **غزوة بدر الكبرى**

20) مصرع أبي جهل

21) **صدى الوقعة في مكة**

22) سواد بن غزية

23) أصحاب القليب

24) شهداء بدر

25) ذكرى هذه الغزوة المباركة

26) الذكرى الثانية

27) غزوة بنى قينقاع

28) غزوة السويق

29) **غزوة أحد**

30) **مقتل حمزة**

31) **بلال** يؤذن للصلاة

32) **الرماة...**

আর **চতুর্থ খন্ডে** রাসুল (সা.) এর কাছে আগমনকারী প্রতিনিধি দলসমূহ এবং রাজা বাদশাহদের কাছে প্রেরিত চিঠিপত্র ও দূতদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অতঃপর রাসুল (সা.) কর্তৃক আরবদেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রেরিত অভিযানাদির আলোচনা করেছেন।[১৩] এই খন্ডটি **عام الوفود** 'আম-আল উফুদ' শিরোনামে পরিচিত। এই খন্ডে অন্তর্ভূক্ত কয়কটি কবিতার শিরোনাম নিম্নরুপ:

1) **وفد نصارى نجران**

2) وفد الأسعريين

3) وفد ثقيف

4) **وفد بني عامر بن صعصعة**

5) **ضمام بن ثعلبة (رضـ)**

6) وفد بني عبد القيس من بالاد هجر البحرين

7) وفد بني حنيفة

8) **عدى بن حاتم**

9) عروة بن مسيك المرادى

10) وفد بني زبيد

11) **وفد كندة**

12) رسول ملوك حمير وحامل كتابهم

13) **وفد بني الحارث بن كعب**

14) رفاعة بن زيد الخزاعى

15) وفد همدان

16) وفد تجيب

17) بقية الوفود

18) **كتب النبي (ص) إلى الملوك**

19) سرايا زيد بن حارثة

20) السرية الثانية وغير ذلك

এই খন্ডে মোট ৫১টি কবিতা স্থান পেয়েছে। ১ম-৪থ খন্ডের মধ্যে সর্বমোট ১১৩+৫১=১৬৪টি কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে।

আরবী সাহিত্যে মহাকাব্য ও দিওয়ানু মাজদিল ইসলাম

আরবী কবিতার আধুনিক যুগের সমৃদ্ধ পর্বে পাশ্চাত্য কাব্য-কলার প্রভাবে বিভিন্ন নতুন নতুন কাব্যরীতি আরবীতে অনুপ্রেবেশ করে। তন্মধ্যে মহাকাব্য বা আখ্যানমূলক কাব্যরীতি **الشعر القصصى أو الملحمى** বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এ জাতীয় কবিতা আরবী সাহিত্যের আধুনিক যুগের শিল্প সঙ্গত সৃষ্টি। প্রাচীন আরবী কাব্য সাহিত্যে এ জাতীয় কাব্যরীতিতে রচিত কবিতার অস্তিত্ব খুজে পাওয়া ভার। এ অধ্যায় আমি মহাকাব্যের পরিচয় শর্তাবলী এবং আহমাদ মুহাররামের ''দিওয়ানু মাজদিল ইসলাম'' সমালোচকদের দৃষ্টিতে মহাকাব্য কিনা তা আলোচনা করার প্রয়াস পাবে।

মহাকাব্যের সংজ্ঞা :

মহাকাব্যের আরবী প্রতিশব্দ **الملحمة** অর্থাৎ (বীরত্বমূলক) মহাকাব্য।[১৪] এর পারিভাষিক সংজ্ঞীয় ড. মুহাম্মদ মান্দর বলেন-[১৫]

قصة شعرية بطولة قومية تقوم على خوارق الأمور، وتختلط فيها الحقائق بالأساطير، وتتغل **القصائد** الدينية والروحية في حناياها.

'অর্থাৎ মহাকাব্য হলো অলৌকিক ঘটনা নির্ভর এবং রূপকথার মিশ্রণযুক্ত জাতীয় বীরোচিত কাব্য- কাহিনী, যাতে নানা সর্গে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কবিতার অস্তিত্ব থাকে।'

অনুরুপভাবে আহমদ কাব্বিশ বলেন-[১৬]

الملحمة فتطلق على قصائد إتسمت بالحديث عن الأبطال، تعتمد على الخيال المجنح وتصور **بطولة** المتحاربين تتميز بالطول وتحكى قصص الأحداث التاريخية وتتجلى فيها تدخل الآلهة.

'যোদ্ধাদের বীরত্ব চিত্র ও কল্পনা মিশ্রিত বীরত্বপূর্ণ ঘটনায় বৈশিষ্টমন্ডিত কাসীদা, যা সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বলিত এবং যাতে অলৌকিক শক্তির প্রবেশ স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

শ্রীশ চন্দ্র দাশ বলেনঃ ''নানা সর্গে বা নানা পরিচ্ছদে বিভক্ত যে কোন কাব্যে কোন সুমহান বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে এক বা বহু বিরোচিত চরিত্র বা অতিলৌকিক শক্তি সম্পাদিত কোন নিয়তি নির্ধারিত ঘটনা ওজস্বী ছন্দে বর্ণিত হয় তাকে মহাকাব্য বলা হয়।[১৭]

এ জাতীয় কাব্য তন্ময় কাব্য। তা ব্যক্তিনিষ্ঠ নয়, বস্তুনিষ্ঠ; লেখকের অন্তর অনুভূতির প্রকাশ নয়, বস্তু প্রধান ঘটনা বিন্যাসের প্রকাশ; গীতি কাব্যেচিত বাশির রাগিনী নয়, যুদ্ধ সজ্জার তুর্য্য নিনাদ।[১৮] পাশ্চাত্য আলঙ্কারিক Aristotle এর মতে, মহাকাব্য আদি, মধ্য ও অন্ত সমন্বিত বর্ণনাত্নক কাব্য এতে বিশিষ্ট কোন নায়েকের জীবন কাহিনী অখন্ডরুপে একই বরোচিত ছন্দের সাহায্যে কীর্ত্তিত হয়। তিনি বলেন:- An epic ahould be based on a single action, one that is a complete whole in itself, with a bigming middle and end, so as to enable the work to produce its own proper pleasure with all the organic unity of a living creature .... As for its metro, the heroi has been assigned it from experience.[১৯]

ড. মুহাম্মদ গুনাইনী হেলাল মহাকাব্যের সংজ্ঞায় বলেন-[২০]

الملحمة هي قصة بطولة تحكى شعرا تحتوى على إفعال عجيبة، **أي على حوادث خارقة للعادة**، وفيها يتجاوز الوصف مع الحوار وصور الشخصيات والخطب، ولكن الحكاية قي العصر الذي يسيطر على ماعداه على أن هذه الحكاية لا تخلو من الأستطورات وعوارض الأحداث.

মহাকাব্য হলো অতি প্রকৃত ও আশ্চর্য ঘটনা নির্ভর বীরোচিত কাহিনী কাব্য যাতে ঘটনা এবং ব্যক্তিত্বের চিত্রায়নে বর্ণনার আতিশয্য থাকবে এবং যা অপ্রসাঙ্গিক ও ঘটনা বহির্ভূত বর্ণনা থেকে মুক্তি থাকবে না।

মহাকাব্যের শর্ত

সংস্কৃত আলংকারিকরা মহাকাব্যের জন্য কতগুলো শর্তারোপ করেছেন। যেমন-

- মহাকাব্যের আখ্যান বস্তু পৌরানিক বা ঐতিহাসিক এবং নয়াক সমস্ত সদগুণের সমষ্ঠিতভূত হবে।
- স্বর্গ সংখ্যা অষ্টাধিক এবং পটভূমি স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল প্রসারী হবে।
- এতে শৃঙ্গার, বীর, শান্ত-এই তিনটির একটি রস মূখ্য বা প্রধান এবং অন্যান্য রস এদের অঙ্গস্বরুপ হবে।
- প্রসঙ্গক্রমে এতে বিভিন্ন ছন্দে, প্রকৃতি, যুদ্ধ বিগ্রহ স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল প্রভৃতির বর্ণনাও থাকতে পারে।
- এর ভাষা ওজস্বী ও গাম্ভীর্য্য-ব্যঞ্জক হবে।
- নায়কের জয় বা আত্মপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মহাকাভ্যের পরিসমাপ্তি হবে। কারণ সাধারণত এতে ট্রাজিডির স্থান নেই।[২১]

  অবশ্য সাহিত্য সমালোকেরা শৈল্পীক মহাকাব্যের জন্য তিনটি শর্তারোপ করেছেন।[২২]

1) الملحمة تعتمد على المعارك والبطولات الحربية فقط.

2) **تقوم الملحمة أسلسا على الخوارق** والخيالات والأساطير

3) الملحمة لها وزن واحد وقافية واحدة.

''মহাকাব্য শুধুমাত্র যুদ্ধ ও যুদ্ধ বীরত্ব বর্ণনার উপর ভিত্তি করে রচিত হবে। তা হবে অলৌকিক, কাল্পনিক ও উপকথা নির্ভর এবং তার আদ্যোপান্ত একই ওজন ও একই অন্ত্যমিল রক্ষিত হবে।''

সমালোচকের দৃষ্টিতে মহাকাব্য হিসেবে দিওয়ানু মাজদিল ইসলাম

আরবীয় কবিদের মধ্য হতে ইসলামী বিষয়ে কবিতা রচনায় যারা অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছেন আহমাদ মুহাররাম তাদের মধ্যে অন্যতম। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য মুহাম্মদ (সা.) এর দৃড়তা ও বীরত্বের যে ইতিহাস কাব্যে তার জীবন্তচিত্র ফুটে তুলতে তিনি অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছে। তিনি কয়েক হাজার শ্লোকের মাধ্যমে রাসুল (সাঃ) এর সমগ্র জীবন লিপিবদ্ধ করেছেন। ফলে যে গ্রন্থটি রূপলাভ করেছে আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে তাকে ديوان مجد الإسلام أو الإلياذة الإسلامية (ইসলামের মর্যাদার দিওয়ান অথবা ইসলামি ইলিয়ড বা মহাকাব্য) নামে স্মরণ করা হয়।[২৩] প্রশ্ন হলো এটি আসলেই মহাকাব্য কি-না। মহাকাব্যের

মানদন্ডে এটি যথার্থ মহাকাব্য হিসেবে বিবেচিত হবে কিনা। এক কথায় উত্তর দিলে বলতে হবে এটি যথার্য মহাকাব্য নয়। কারণ শৈল্পিক মহাকাব্যের জন্য যে কটি শর্ত আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি তার মানদন্ডে এটি যথার্থ মহাকাব্য বলে বিবেচিত হবে না। কারণ:

১। মহাকাব্যে শুধুমাত্র যুদ্ধ ও যুদ্ধে নায়কের বীরত্বের বর্ণনা থাকে। কিন্তু আহমাদ মুহাররাম স্বীয় গ্রন্থে ইসলামী দাওয়াতের প্রসার কল্পে রাসুল (সাঃ) এর শান্ত ও যুদ্ধ উভয় অবস্থার প্রচেষ্টাকেই লিপিবদ্ধ করেছেন। আর ইহা মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্যের বিপরীত।

২। মহাকাব্য হবে অলৌকিক। কল্পনা ও উপকথা নির্ভর। কিন্তু আহমাদ মুহাররাম ইসলামের সত্যনিষ্ঠ প্রতিষ্ঠিত ঘটনাবলীর সাথে কল্পনার রং মিশ্রিত করে স্বীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করতে সামর্থ হননি।

৩। মহাকাব্যের আদ্যোপান্ত একই ওজন ও একই অন্ত্যমিল রক্ষিত হয়। অথচ আহমাদ মুহাররাম তাঁর মহাকাব্যের বিভিন্ন কাসীদাতে বিভিন্ন ছন্দ ও অন্ত্যমিল ব্যবহার করেছেন। এর পাশাপাশি তাতে অনেকগুলো বিষয়বস্তু অন্তর্ভূক্ত করেছেন। অথচ প্রকৃত মহাকাব্যের বিষয়বস্তু হবে শুধুমাত্র যুদ্ধ ও এতদসংক্রান্ত বিষয়।[২৪]

ফলে আহমাদ মুহাররামের মহাবাক্যটি পাঠ করলে প্রতিয়মান হয় যে, মহাকাব্যের শৈল্পীক বৈশিষ্ট্য এখানে অনুপস্থিতি। কেননা কবি তাতে নিরেট রাসুল (সা.) এর জীবন চরিত্র রচনা করেছেন। তাতে যুদ্ধের বিবরণ যেমন রয়েছে তেমনি যুদ্ধ ব্যতিত অপরাপর বিষয়ের বিবরণ ও বিধৃত হয়েছে। এছাড়া তিনি সেখানে কেবল বাস্তব ইতিহাস ও ঘটনাবলীর চিত্র তুলে করেছেন। ফলে তা বাস্তবতার সাথে কল্পনার রং ছড়ানের উপযোজ্য মহাকাব্যের মূল প্রাণ থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছে। শৈল্পীক এককের পরিবর্তে সেখানে শৈল্পীক বিচিত্রতা বিদ্যমান। এছাড়া গীতি প্রকৃতির আমেজও সেখানে বহুলাংশে দেখা যায়। তিনি বিভিন্ন ছন্দ ও অন্ত্যমিলের সমন্বয়ে মহাকাব্যটি রচনা করেছেন।[২৫]

তাহলে প্রশ্ন জাগে আসলে এটা কী? এই প্রশ্নের জবাবে আমি ড. শাওকী দ্বায়ফ এর ব্যক্তব্যকেই জবাব হিসেবে উপস্থান করব। তিনি বলেন[২৬]

وأكبر الظن أنه وقد اتضح لنا الآن صوت محرم في هذه الإلياذة بكل سماته وخصائصه فهو **لا يكتب** ملحمة كالملحمة التي كتب فيها هو مبروس الياذة، وإنما يكتب أو قل ينظم سيرة الرسول، وفرق كبير **بين الناس والشعر والقصصي**...

প্রবল ধারনার ভিত্তিতে একথা বলা যথাযথ হবে যে, আহমাদ মুহাররামের মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্যবলী ও লক্ষণ বিবেচনার আমাদের কাছে যে বিষয়টি স্পষ্ট তা হলো, তিনি আসলে হোমারের 'ইলিয়ড' এর ন্যায় মহাকাব্য রচনা করেননি। বরং তিনি রাসুল (সা.) এর জীবন চরিত্র রচনা করেছেন। জীবনী ও আখ্যানমূলক কাব্যের

মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান। কেননা প্রথমটি যান্ত্রিক কর্ম এবং দ্বিতীয়টি শৈল্পীক। আহমাদ মুহাররাম প্রথমে ইতিহাস অধ্যয়ন করেছেন অতঃপর তা কাব্যে রুপান্তরিত করেছেন। ফলে একটি শুস্ক নিস্প্রাণ মহাকাব্য সৃষ্টি হয়েছে।[২৭]

যদিও মহাকাব্য হওয়ার যথাযথ শর্তাবলী এতে পাওয়া যায় না, তথাপিত্ত কিছু কিছু বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে একে الإلياذة الإسلامية বা ইসলামী ইলিয়ড/মহাকাব্য হিসেবে কেউ কেউ দাবী করেছেন। সেগুলো হলো-

১। মহাকাব্যের শর্তানুযায়ী এতে যুদ্ধও বীরত্বমূলক বর্ণনা বিদ্যমান।

২। মহাকাব্যের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক শ্লোকও এতে আছে। আর এ কারণে একে ইসলামী মহাকাব্য বলা হয়।

তথ্যসূত্র

১। আহমাদ কাব্বিশ, *তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীছ*, পৃ. ৯৮।

২। আহমাদ আব্দুল লতীফ আল-জাদা ওয়া হুসনী আদ্হাম জারার, *শু'আরা আল-দা'ওয়াত আল-ইসলামিয়্যা ফি আল-আসর আল-হাদীছ*, পৃ. ৬৫।

৩। আহমাদ কাব্বিশ, *তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীছ*, পৃ. ৬৫।

৪। আহমাদ মুহাররাম, *দিওয়ানু মাজদিল ইসলাম*, পৃ-৩১ ও আহমাদ আব্দুল লতীফ আল-জাদা ওয়া হুসনী আদ্হাম জারার, *শু'আরা আল-দা'ওয়াত আল-ইসলামিয়্যা ফি আল-আসর আল-হাদীছ*, পৃ. ৭০-৭১।

৫। আহমাদ আব্দুল লতীফ আল-জাদা ওয়া হুসনী আদ্হাম জারার, *শু'আরা আল-দা'ওয়াত আল-ইসলামিয়্যা ফি আল-আসর আল-হাদীছ*, পৃ. ৩১-৩৩।

৬। আহমাদ মুহাররাম, *দিওয়ানু মাজদিল ইসলাম*, পৃ. ৩৩।

৭। আহমাদ মুহাররাম, *দিওয়ানু মাজদিল ইসলাম*, পৃ.৭০-৭১।

৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

৯। মুহাম্মদ ইবন সা'দ ইবন হুসাইন, *আল-আদব আল-হাদীছ তারীখ ওয়া দিরাসাত*, পৃ. ২০১ ও http://ar.wikipedia.org/wiki

১০। আহমাদ মুহাররাম, *দিওয়ানু মাজদিল ইসলাম*, পৃ. ৩৫।

১১। http://ar.wikipedia.org/wiki

১২। আহমাদ মুহাররাম, *দিওয়ানু মাজদিল ইসলাম*, পৃ. ৩৬।

১৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

১৪। ড. মোঃ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, (ঢাকা: রিয়া প্রকাশনী, ২০০৬), ৩য় সংস্করণ।

১৫। ড. মুহাম্মদ মান্দুর, *আল-আদাব ওয়া ফুনুনুহু*, (মিশর: দায় আল-নাহদাতি মিশর), পৃ. ৪৪।

১৬। আহমাদ কাব্বিশ, *তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীছ*, পৃ. ৩৭২।

১৭। শ্রী চন্দ্র দাস, *সাহিত্য সন্দর্শন*, (ঢাকা: বর্ণ বিচিত্র, ১৯৯৪), পৃ. ৮০।

১৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

১৯। প্রাগুক্ত, প্র. ৭৯।

২০। ড. মুহাম্মদ গুনাইনী হেলাল, *আল-আদাব, আল-মুকারিন*, (মিগর দার আল-নাহদাতি), পৃ. ১৪৪।

২১। শ্রী চন্দ্র দাস, *সাহিত্য সন্দর্শন* (ঢাকা: বর্ণ বিচিত্র, ১৯৯৪), পৃ. ৭৯।

২২। http://www.ai.jazirah.com.sa/aleem//esson-2688.html

২৩। প্রাগুক্ত ও আহমাদ কাব্বিশ, *তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীছ*, পৃ. ৯৮।

২৪। http://www.ai.jazirah.com.sa/aleem//esson-2688.html

Dhaka University Institutional Repository

২৫। আল-বালাগাত ওয়া আল-নকদ লিস্ সাফফিস ছালিচ ছানভী।

২৬। ড. শাওকী দ্বায়ফ, *দিরাসাত ফি আল-শি'র আল-আরাব, আল-মু'আছির*, পৃ. ৫৪।

২৭। আহমাদ কাব্বিশ, *তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীছ*, পৃ. ১০০।

খ) সাত সাগরের মাঝি

ভূমিকা

কবি ফররুখ আহমদ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী একজন শক্তিমান মৌলিক প্রতিভাধর কবি। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা ও আঙ্গিকে তিনি সাহিত্য চর্চা করেছেন। একাধারে তিনি গীতি-কবিতা, মহাকাব্য, সনেট, কাব্য-নাট্য, ব্যঙ্গ কবিতা, শিশুতোষ কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ এবং উপন্যাস রচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর কম-বেশি অবদান রয়েছে। সর্বক্ষেত্রেই তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ সুস্পষ্ট। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় কাজ করলেও তিনি ছিলেন প্রধানত কবি। কাব্য ক্ষেত্রেই তাঁর অবদান সমধিক এবং তাঁর প্রধান পরিচয় কবি হিসেবে। ফররুখ আহমদের জন্ম ইংরেজ আমলে এবং পরাধীনতার যুগে। মধ্য তিরিশে তাঁর কাব্য প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। ১৯৩৬ সালে খুলনা স্কুল ম্যাগাজিনে তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হয়। তবে চল্লিশের দশকের শুরুতেই কবি হিসেবে তাঁর পরিচিতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।[১]

‘সাত সাগরের মাঝি’ কাব্যের পটভূমি

১৯৪০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে ‘লাহোর প্রস্তাব’ গৃহীত হওয়ার পর এদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হয়। উপমহাদেশের মুসলমানগণ তখন ভারতের সংখ্যাগোরিষ্ঠ মুসলিম এলাকা নিয়ে স্বাধীন স্বদেশভূমি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সংঘবদ্ধ আন্দোলন শুরু করে। লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী উপমাহাদেরশর পূর্বাঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। ঐ সময় সকল বাঙালি মুসলিম কবি-সাহিত্যিক-সংস্কৃতি সেবীই তাঁদের লেখায় ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে এ অঞ্চলে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর। এর ফলে কলকাতায় ‘পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি’ গঠিত হয়। এ সংগঠনের ব্যানারে বাঙালি মুসলিম কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক-সংস্কৃতিসেবীগণ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করেন। বিবিন্ন সভা-সমিতির মাধ্যমে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় সকলকে সচেতন করার প্রয়োস পান। এরূপ সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ফররুখ আহমদের কাব্যচর্চা শুরু হয়। তখন বাঙালি মুসলমানদের মনে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি তথা সমগ্র চিন্তা-চেতনায় এক নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। এরই প্রেক্ষাপটে ফররুখ আহমদের ‘সাত সাগরের মাঝি’ (১৯৪৪) ‘আজাদ করো পাকিস্তান’ ১৯৪৬ ও অন্যান্য অসংখ্য কবিতা রচিত হয়।[২]

চল্লিশের দশকের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো পঞ্চাশের মন্বন্তর। ১৯৩৯-৪৫ সময়কালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪৩ (বাংলা ১৯৫০) সমগ্র বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষাবস্থার সৃষ্টি হয়। এ সময় অনাহারে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করে। সমকালীন অনেক কবিই এ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের চিত্র তাদের কবিতায়

তুলে ধরেছেন। ফররুখ আহমদ মন্বন্তর বিষয় প্রায় ১৯টি কবিতা লিখেছেন। তন্মধ্যে 'লাশ' ও 'আওলাদ' দুটি কবিতা যা তার 'সাত সাগরে মাঝি' কাব্যের অর্ন্তভুক্ত।[৩] এ সম্পর্কে বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্য সমালোচক মোহাম্মদ মাহফুউল্লাহ বলেনঃ 'দেশ বিভাগের আগে পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমিতেই এই কবিতাগুলোর জন্ম'।[৪]

'সাত সাগরে মাঝি' কাব্যের প্রকাশ কাল

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ১৯৪৪। প্রকাশক: বেনজীর আহমদ, নওরোজ পাবলিশিং হাউজ, ১০৬-এ সার্কাস রোড, কলকাতা। মূল্য: দুই টাকা। প্রচ্ছদ শিল্পী: জয়নুল আবেদীন। (দ্বিতীয় সংস্করণ) তমদ্দুন সংস্কারণ: সেপ্টেম্বর ১৯৫২। রচনাকাল: ১৯৪৩-৪৪। প্রকাশক ও মুদ্রাকর: তৈয়েবুর রহমান, এম.এ তমদ্দুন প্রেস, ৫০ লালবাগ রোড, ঢাকা, পূর্ব পাকিস্তান। দাম: দুই টাকা আট আনা। প্রচ্ছদ শিল্পী: কামরুল হাসান। পৃষ্ঠা: ৮৩।[৫] এস.ওয়েজ তৃতীয় মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারী ২০১৪। প্রকাশক: মোহাম্মদ লিয়াকত উল্লা, ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, লিয়াকত প্লাজা, ৯ বাংলাবাজার।[৬]

প্রথম সংস্করণে প্রকাশক কবির একান্ত সুহৃদ ও বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি বেনজীর আহমদ তাঁর ভূমিকায় বলেনঃ ''সারা পৃথিবী যখন ধ্বংস ও মৃত্যুর পথে আগাইয়া চলিয়াছে, বিশেষ করিয়া এই সোনার বাংলার আমরা সোনার চাঁদের, সোনার ধানের অতি প্রাচুর্যে যখন নিত্য স্বর্গ যাত্রার ভীড় লাগাইয়া রাখিয়াছি এবং সর্বোপরি এই সুলভতার দিনে হঠাৎ পুস্তক প্রকাশ বিশেষ করিয়া কাব্যপুস্তক প্রকাশের এই উৎকট বিলাসিতা কেন-সে প্রশ্ন স্বতঃই জাগা স্বাভাবিক। ইহার উত্তরে সবিনয়ে আমরা শুধু এই কথায় বলিব রাতের অন্ধকারতম অংশই অদূরাগত ছুবে-ছাদিকের নকিব এবং এই সময়েই মোয়াজ্জিনের কণ্ঠস্বর ঊষার আযানের তাকবির ধ্বনি জাগার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। মহাকবি ইকবালের ভাষায় বলতে গেলে আমাদের অধিকাংশ কাব্যই মৃত্যুর বন্দনাগীতি ছাড়া আর কিছু নয়। তাই তাঁহারই ভাষায় বলিতে চাইঃ ওগো বন্ধু। যদি তোমার তহবিলে কাব্যের তনখা থাকিয়া থাকে মৃত্যুহীন জীবনের পরমা পরে তাহাকে ছোঁয়াইয়া নাও। পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিচিন্তাধারাই কর্মপথের সন্ধানী দূত যেমন বজ্রবর্ষনের পূর্বে আসে বিজুলি চমক। ফররুখ আহমদের কাব্যে সেই ঊষার আযানের সুর, জীবনদায়িনী পরশ আর বজ্রগর্ভ বিজলীর জ্যেতিজ্বালা আছে বলিয়ায় আমাদের বিশ্বাস। সেই জন্যই তাহার এই কাব্য প্রকাশে আমাদের এই দুরুহ প্রয়াস। এই পুস্তকের সংশোধন ব্যাপারে আমাদের সাহিত্যিক বন্ধু অদ্বৈত মল্লবর্মন প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহার নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। কলকাতা গর্ভনমেন্ট আট স্কুলের অধ্যাপক বিখ্যাত রেখাশিল্পী মিঃ জয়নুর আবেদীন এই পুস্তকের প্রচ্ছদটি আঁকিয়া দিয়াছেন। তাঁহার খেদমতে আমাদের অসংখ্য শুকরিয়া।'[৭]

'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যের প্রথম প্রকাশ সম্পর্কে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কবি ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন : ''ফররুখ আহমদের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় ১৯৪৪ এ নিতান্ত ঘরোয়া পরিবেশে। হাতে তৈরী টিটাগড়ের একরূপ অমসৃণ কাগজে মুদ্রিত হলো তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' কবি বেনজীর আহমদের অর্থানুকূল্যে। সেই গ্রন্থের একটি কপি তিনি দিতে এসেছিলেন ৩৯, সৈয়দ আমির আলী এভিনিউতে (পার্ক সার্কাস, কলকাতা) তদানিন্তন তরুণ মুসমিল ছাত্র-আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও প্রেসিডেন্সি কলেজের একদা সাহিত্যবার্ষিকী এবং রুপায়ন পত্রিকার সম্পাদক জনাব আবু সাঈদ চৌধুরীকে।''[৮]

'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যের অর্ন্তগত কবিতা সমূহ

এই কাব্যের অর্ন্তভূক্ত বিভিন্ন কবিতাগুলির প্রথম প্রকাশকাল ও কোন পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয় সে সম্পর্কে নিচে একটি তালিকা প্রদত্ত হলো। তালিকাটি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ও আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত ফররুখ রচনাবলী (১৯৭৯) থেকে বিরচিত:

কবিতার নাম	পত্রিকার নাম	সময়কাল
''সিন্দাবাদ	ঃ সওগাত	পৌষ, ১৩৫০
বা'র দরিয়ায়	ঃ সওগাত	মাঘ, ১৩৫০
দরিয়ায় শেষ রাত্রি	ঃ মাসিক মোহাম্মদী	মাঘ, ১৩৫০
শাহরিয়ার	ঃ মাসিক মোহাম্মদী	আশ্বিন, ১৩৫১
বন্দরে সন্ধ্যা	ঃ মাসিক মোহাম্মদী	-
ঝরোকায়	ঃ মাসিক মোহাম্মদী	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১
ডাহুক	ঃ সওগাত, কার্তিক	১৩৫১
এই সব রাত্রি	ঃ মাসিক মোহাম্মদী	-
পুরনো মাজারে	ঃ মাসিক মোহাম্মদী	আষার, ১৩৫১
পাঞ্জেরী	ঃ মাসিক মোহাম্মদী	-
স্বর্ণ ঈগল	ঃ মাসিক মোহাম্মদী আষার	১৩৫১
লাশ	ঃ মাসিক মোহাম্মদী	১৩৫০
তুফান	ঃ মাসিক মোহাম্মদী	আষার, ১৩৫০
হে নিশান বাহী	ঃ মাসিক মোহাম্মদী	চৈত্র, ১৩৪৯

নিশান	ঃ মাসিক মোহাম্মদী	আশ্বিন, ১৩৫১
নিশান বরদার	ঃ মাসিক মোহাম্মদী	-
আউলাদ	ঃ মাসিক মোহাম্মদী	ভাদ্র, ১৩৫০
সাত সাগরের মাঝি	ঃ মাসিক মোহাম্মদী	বৈশাখ, ১৩৫০

উপরোক্ত তালিকা থেকে জানা যায়, 'সাত সাগরের মাঝি'র অন্তর্ভুক্ত সবগুলো কবিতাই 'মাসিক মোহাম্মদী' ও 'সওগাত' এ দুটি পত্রিকায় বাংলা ১৩৫০-১৩৫১ সনের (ইংরেজি-১৯৪৩-৪৪) মধ্যে প্রথম প্রকাশিত হয়।[৯]

ভাব ও বিষয়বস্তুর আলোকে 'সাত সাগরের মাঝি'

ফররুখ আহমদের উপর লেখা সর্বপ্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের রচিয়তা ডক্টর সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় ভাব ও বিষয়-বস্তুগত দিক বিচার করে সাত সাগরের মাঝি' কাব্যের অন্তর্ভূক্ত কবিতাগুলোকে মোট চারভাগে বিভক্ত করে এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পান। এ শ্রেণীবিভাগুলো হলো নিম্নরুপ:

এক. ইসলামীভাব, ঐতিহ্য ও জাতীয় জাগরণমূলক কবিতা।

দুই. বাস্তব অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ বস্তনিষ্ঠা কবিতা।

তিন. রোমান্টিক কবি-চিত্তের ব্যাকুলতা বিষয়ক

চার. প্রেম বিষয়ক কবিতা।

প্রথম বিভাগের অন্তর্ভূক্ত কবিতাগুলো হচ্ছেঃ সিন্দাবাদ, বা'র দরিয়া, দরিয়ার শেষ রাত্রি, আকাশ-নাবিক, বন্দরে সন্ধ্যা, এইসব রাত্রি, পুরানো মাজারে, পাঞ্জেরী, স্বর্ণ ঈগল, তুফান, হে নিশানবাহী, নিশান বরদার ও সাত সাগরের মাঝি।

দ্বিতীয় শ্রেণিভূক্ত কবিতাগুলো হচ্ছেঃ লাশ ও আওলাদ।

তৃতীয় শ্রেণীভূক্ত মাত্র একটি কবিতাঃ 'ডাহুক'

চতুর্থ শ্রেণীভূক্ত দুটি কবিতাঃ শাহরিয়ার ও ঝরোকা।[১০]

'সাত সাগরের মাঝি'-কাব্যগ্রন্থের পর্যালোচনা

'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত কবিতা সমূহের প্রথম শ্রেণীভূক্ত কবিতাগুলি ইসলামী ভাব, ঐতিহ্য ও জাতীয় জাগরণমূলক। এ কবিতাগুলো একাধারে যেমন ইসলামী ঐতিহ্য ও জাতীয় জাগরণমূলক, তেমনি তা সমুদ্র অভিযান বিষয়ক। রূপক-উপমা-প্রতীকের মাধ্যমে কবি এক বিশাল ক্যানভাসে তাঁর কল্পনার

দিগন্তকে উন্মোচিত করেছেন। সিন্দাবাদ কবিতায় সিন্দাবাদ কাহিনীর প্রতীকী আধারে কবি মুসলমানদের অতীত গৌরবময় দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে আত্ম-শক্তিতে বলীয়ান ও নবজাগরণের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। কবি বলেন:[১১]

''কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদর তাজ,
পাহার বলন্দ ঢেউ বয়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক;
নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দাবাদ''

এই কাব্যের প্রথম তিনটি কবিতা অর্থাৎ সিন্দাবাদ 'বা'র দরিয়া' শেষ রাত্রি' এবং পাঞ্জেরী ও সর্বশেষ কবিতা সাত সাগরের মাঝি' এ কবিতাগুলো সমুদ্র বিষয়ক কবিতা। এ সকল কবিতায় কবি সমুদ্রের যে বর্ণনা দিয়াছেন তা পাঠে পাঠক প্রত্যক্ষ সমুদ্র দেখার অনুভূতি পাবে। কবি যেভাবে সমুদ্রকে নির্মাণ করেছে তা সত্যই অসাধারণ। কবি সমুদ্রের বিস্তার স্থবিরতা এবং তরঙ্গ ক্ষুব্ধতার কথা বলেছেন, কবি দ্বীপের কথাও বারবার বলেছেন, কবির বর্ণনায় উদ্দাম ঢেউয়ের কথা আছে, স্রোতের কথা আছে, আছে বন্দরের কথা যেখানে জাহাজ নোঙ্গর ফেলে। এগুলো সবই সমুদ্র বিষয়ক কবির কল্পনা। যেমন কবির ''সিন্দাবাদ'' নামক কবিতায়[১২]

''রাত জেগে শুনি খোদার আলমে বিচিত্র কল্লোল
তারা ছিটে পরে মধ্য সাগরে জাহাজে জাগায় দোল,
আমরা নাবিক জঙ্গী জোয়ান ইশারা পেয়েছি কত
মউজের মত তাই ভেসে যাই টুকরা খাড়ের মত।
বজ্র আওয়াজ থামায়ে গভীর দরিয়ায় ওঠে চাঁদ
দিলের দুয়ারে মাথা ঠুকে মরে নাবিক সিন্দাবাদ।''

কবি সমুদ্রের বর্ণনা দিয়ে গিয়ে ঢেউয়ের বর্ণনা এনেছেন বারবার। ঢেউ কখনো অশ্বের মত ছুটে চলে, কখনো অজাগারের মত সামনে এগিয়ে চলে। তাঁর সম্পূর্ণ বর্ণনাটা কাল্পনিক হলেও তাতে তিনি একটি আশ্চর্য সাবলীল গতি মূর্ছনার সৃষ্টি করেছেন। যেমন 'বা'র দরিয়া' কবিতায় সমুদ্রের বর্ণনা:[১৩]

''সমুদ্র থেকে সমুদ্র ঘোরে দিরয়ার সাদা তাজী।
খুরের হালকা, ধারালো দাঁতের আঘাতে ফুলকি জ্বলে

কেশর ফোলানো পালে লাগে হওয়া; মাস্তুলে দোলে চাঁদ,

তারার আগুনে পথ বেছে নেয় স্বপ্নেরা সারারাত,

তাজী ছুটে চলে দুরন্ত গতি দুর্বার উচ্ছল;

সারারাত ভরি তোলপাড় করি দরিয়ার নোনাজল।

'আকাশ নাবিক' কবিতায় কবি দুর্জয় মুসলিম আত্মার বিবরণ দিয়েছেন। মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের বর্ণনা দিয়ে অধ:পতিত মুসলমানদের নতুন ভাবে জেগে ওঠার আহবান জানিয়েছেন। কবি বলেন:[১৪]

''আজকে আবার সেখানে ফিরতে হবে।

পার হয়ে এই যক্ষ্মাবসাদ শ্রান্ত ব্যাধিত ঘেরা,

পর হয়ে এই বজ্র নিপাত আকাশের বুক-চেরা

দিতে হবে ফের আধারের বুকে চাষ

ভরাতে আনার কলিতে বন্ধ্যা মরুভূর অবকাশ

আনতে নতুন বীজ যেতে হবে ফারাণের অভিযোনে,

ভরাতে মাটির রক্ষাতা সেই প্রবল জোয়ার টানে।''

'পাঞ্জেরী' ফররুখ আহমদের একটি বিখ্যাত কবিতা। এটাকে তাঁর অন্যতম প্রতিনিধিত্ব মূলক কবিতা হিসাবেও উল্লেখ করা হয়। পাঞ্জেরী কবিতায় ঐতিহ্য চেতনা ও অতীত চিন্তার সাথে বর্তমানের ভাবনা-কল্পনা যেন এক সূত্রে গ্রথিত হয়েছে। প্রতীকী কল্পনার মাধ্যমে কবি এখানে ইসলামী পুনরুজ্জীবনের অন্তরঙ্গ আবেদন ব্যক্ত করেছেন। সাত সাগরের মাঝি কাব্যগ্রন্থে সর্বশেষ কবিতাটির নাম 'সাত সাগরের মাঝি'। এই কবিতার মধ্যে কবি মূলত সিন্দাবাদের কথায় বলেছেন, তবে এখানে সরাসরি তার উল্লেখ নেই। এটি শুধু এই কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা নয় সমগ্র বাংলা কাব্যের প্রোক্ষাপটে বিচার করলেও এটাকে একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা হিসেবে গণ্য করা চলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যেমন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' নজরুল ইসলামের যেমন 'বিদ্রোহী' ফররুখ আহমদেরও তেমনি 'সাত সাগরের মাঝি।'[১৫] 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতাটি নিদ্রামগ্ন অধ:পতিত মুসলিম জাতির নবজাগরণের অমর সঙ্গীত। কবিতার শুরুতেই কবির বর্ণনাঃ[১৬]

'কত যে, আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হল জানিনা তা।

নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।

দুয়ারে তোমার সাত-সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা।

তবু জাগলে না? তবু তুমি জাগলে না? '

ইসলামের গৌরবযুগে এক সময় মুসলমানরা সাত সাগরের মাঝি ছিল। দরিয়ার বুকে কিশতী ভাসিয়ে তারা দেশ-বিদেশ পরিভ্রমন করতো। নিজের ভুলে তারা সে বাদশাহী হারিয়ে ফেলেছে। আধারের পরে আলো, রাত্রি শেষে দিনের অনিবার্য আবির্ভাব। কবি তাই দিব্যদৃষ্টিতে এক দীর্ঘ তমা যুগের অবসান প্রত্যক্ষ করেছেন। কবির কণ্ঠে:[১৭]

''কাঁকর বিছানো পথ,
কত বাধা, কত সমুদ্র, পর্বত,
মধ্যদিনের পিশাচের হামাগুড়ি,
শুকনি ফেলেছে ছায়া আমাদের মাথার উপরে উড়ি;
ফেলেছি হারায়ে তৃণঘন বন, যত পুষ্পিত বন,
তবু দেখা যায় দূরে বহুদূরে হেরার রাজ তোরণ
শাহী দরজার সকল কপাট অনেক আগেই খোলা,
অনেক আগেই সেখানে দ্বাদশী জোছনা দিয়েছে দোলা।''

এরপর আর হতাশ হওয়ার অবকাশ নেই। তাই হতাশাগ্রস্থ মুসলিম জাতিকে নবজাগরণের আহবান জানিয়ে কবি বলেন:[১৮]

'হে মাঝি! এবার তুমিও পেয়োনা ভয়,
তুমিও কুড়াও হেরার পথিক-তারকার বিস্ময়,
ঝ'রুক এ ঝড়ে নারঙ্গী পাতা, তবু পাতা অগণন
ভিড় করে যেথা জাগছে আকাশে হেরার রাজ-তোরণ।
সে পথে যদিও পার হ'তে হবে মরু
সে পথে যদিও দরিয়ার নোনা পানি,
তবু সে পথে আছে মঞ্জিল, জানি আছে ছায়াতরু
পথে আছে মিটে পানি।''

এই কাব্যগ্রন্থটি একদিকে যেমন কবির প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ তেমনি কবির সামগ্রিক কাব্য সাধানায় বিশ্বাস এবং অভিরুচির দিক নির্দেশনা এই কাব্যগ্রন্থে রয়েছে। কবি 'সাত সাগরের মাঝিতে' যে কথা বলতে চেয়েছেন, সে কথা তাঁর কাব্যগ্রন্থের মূল তৃষ্ণা।

দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত কবিতার বিষয়বস্তু প্রথম শ্রেণীভুক্ত কবিতা থেকে কিছুটা ভিন্ন। এ কবিতাগুলো কবির জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত। এই শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত কবিতা হলো 'লাশ' ও 'আওলাদ'। ফররুখ আহমদ মূলত রোমান্টিক কবি। তা সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। 'লাশ' ও 'আওলাদ' কবিতায় এই ব্যতিক্রম দিকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাংলা ১৩৫০ সালে মন্বন্তরের যে কালো ছায়া নেমে এসেছিল আমাদের সমাজে তার এক অতি জীবন্ত আলেখ্য প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে 'লাশ' কবিতায়।[১৯] কবির কণ্ঠে:[২০]

'যেখানে প্রশস্ত পথ ঘুরে গেল মোড়
কালো পিচ-ঢালা রঙে লাগে নাই ধুলির আঁচড়
সেখানে পথের পাশে মুখ গুঁজ পড়ে আছে জমিনের প'র
সন্ধ্যার জনতা জানি কোনদিন রাখে না সে মৃতের খবর।
জানি মানুষের লাশ মুখ গুঁজে পড়ে আছে ধরনীর প'র
ক্ষধিত অসাড় তনু বত্রিশ নাড়ির তাপে প'ড়ে আছে নিসাড়
পাশ দিয়ে চলে যায় সজ্জিত পিশাচ নারী নর
–পাথরের ঘর,
মৃত্যু করাগার
সজ্জিতা নিপুনা নটি বারাঙ্গানা খুলিয়াছে দ্বার
মধুর ভাষণে, পৃথিবী চষিছে কারা শোষণে শাসনে
সাক্ষ্য তার রাজপথে জমিনের পর
সাড়ে তিন হাত হাড় রচিতেছে মানুষে অন্তিম কবর।''

অন্ত:সারশূণ্য আধুনিক সভ্যতার বিরুদ্ধে তীব্র-কঠোর আঘাত। কবি মনে করেন এ সমাজ সভ্যতা দ্বারা পরিচালিত নয় বরং মানবতা বিরোধী শয়তানি শক্তি, লোভ, লালসা, কামনা, বর্বরতা ইত্যাদি দ্বারা পরিচালিত, তিনি এই জড় সভ্যতাকে পদাঘাতে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে মানবতার চির কল্যাণময় সভ্যতার পত্তন ঘটাতে চান। কবি বলেন:[২১]

''হে জড় সভ্যতা।
মৃত সভ্যতার দাস স্ফীতমেদ শোষক সমাজ।
মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ;
তারপর আসিলে সময় বিশ্বময়

তোমার শৃংখলগত মাংসপিন্ডে পদাঘাত হানি

নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বার প্রান্তে টানি;

আজ এই উৎপাড়িতের মৃত্যু দীর্ণ নিখিলের অভিশাপ বও;

ধ্বংস হও

তুমি ধ্বংস হও।''

তৃতীয় শ্রেণীর অর্ন্তভূক্ত কবিতায় ফররুখ আহমদের রোমান্টিক কবি চিত্তের ব্যাকুলতার প্রকাশ ঘটেছে। এই শ্রেণীভূক্ত মাত্র একটি কবিতা যার নাম 'ডাহুক'। এটি তাঁর একটি সুবিখ্যাত কবিতা। সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পটভূমিতেও এটি নিঃসন্দেহে একটি অতি উল্লেখযোগ্য কবিতা। কবিতার শুরুতেই কবি কী আশ্চর্য চমৎকারিত্বের সাথে পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন:[২২]

''রাত্রি ভর ডাহুকের ডাক

এখানে ঘুমের পাড়া, স্তবদ্ধ দিঘি অতল সুপ্তির।

দীর্ঘ রাত্রি একা জেগে আছি।''

এই কবিতার অন্তরনিহিত তাৎপর্য বর্ণনায় কবি নিজেই বলেন-''গভীর রাতে নীরব নির্জন কোন গ্রাম্য মসজিদে মুজাদ্দেদী তরিকার কোন সাধক যখন 'আল্লাহু' 'আল্লাহু' জিকির করতে থাকেন, তখন মনে হয় অবিকল যেন একটা ডাহুক এক মনে ডেকে চলছে। আমার 'ডাহুক' কবিতা এই ধরনের মোজাদ্দেদী সাধকের জিকির নিয়েই রচিত।[২৩]

চতুর্থ শ্রেণীভূক্ত কবিতার প্রধান বিষয়বস্তু হলো প্রেম। ফররুখ আহমদের কাব্যে প্রমে একটি অন্যতম উপজীব্য বিষয়। তিনি ইসলামী রেনেসাঁও ঐতিহ্যের কবি হসিবে পরিচিত হলেও প্রত্যেক কবিরই প্রেম বিষয় কবিতা থাকেই। এই কাব্যের অর্ন্তগত 'শাহবিয়ার' ও 'ঝরোকা' নামক দু'টি কবিতায় প্রেমের বর্ণনায় ফররুকের অভিনবত্ব ও নৈপুন্য যেমন চিত্তাকর্ষক হয়েছে তেমনি তা বিশেষত্বে অম্লান।

পরিশেষে বলব আমাদের আধুনিক কাব্যেধারার পথ নির্মাণে ফররুখ আহমদ নিঃসন্দেহে একজন প্রতিভূ পুরুষ।

তথ্য সূত্র

১। অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ প্রতিভা*, পৃ. ৭৭।
২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮।
৩। প্রাগুক্ত, প্র-৭৮।
৪। অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ আহমদের সাত সাগরের মাঝি*, পৃ. ১৯।
৫। *কবি ফররুখ আহমদ জীবন ও সাহিত্যবিষয়ক তথ্যপুঞ্জি*, মুহাম্মদ মতিউর রহমান, পৃ. ৩৯।
৬। ফররুখ আহমদ, *সাত সাগরের মাঝি*, পৃ. ২।
৭। অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ আহমদের সাত সাগরের মাঝি*, পৃ. ১৮-১৯।
৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।
৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০।
১০। অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ প্রতিভা*, প. ১৯৮।
১১। ফররুখ আহমদ, *সাত সাগরের মাঝি*, পৃ. ৯।
১২। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।
১৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।
১৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।
১৫। অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ প্রতিভা*, পৃ. ২১৮।
১৬। ফররুখ আহমদ, *সাত সাগরের মাঝি*, পৃ. ৫৯।
১৭। প্রাগুক্ত, প. ৬১।
১৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।
১৯। অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ প্রতিভা*, প. ২২৯।
২০। ফররুখ আহমদ, *সাত সাগরের মাঝি*, পৃ. ৪১।
২১। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।
২২। অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ প্রতিভা*, পৃ. ২৩৩।
২৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯

গ) সিরাজাম মুনীরা

ভূমিকা

প্রত্যেক মানুষের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে। একজনের স্বভাব বৈশিষ্ট্যের সাথে অন্যজনের স্বভাব বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ মিল খুঁজে পাওয়া দুস্কর। কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকের বেলায়ও একই কথা। তাদের প্রত্যেকের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান মৌলিক প্রতিভাধর কবি ফররুখ আহমদও তেমনি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য প্রয়াসী একজন সৃজনশীল প্রতিভা, নিম্নে এই কবির অন্যতম কাব্যগ্রন্থ 'সিরাজাম মুনীরা' সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়োস পাব।

'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যগ্রন্থের পটভূমি

প্রথম জীবনে কবি ফররুখ আহমদ বামপন্থী ধ্যান ধারনায় বিশ্বাসী ছিলেন। বামপন্থি চিন্তা-চেতনা ও বাম কবিদের সাথে তখন তাঁর সম্পৃক্ততা ছিল গভীর। পরবর্তীতে আলহাজ্ব মৌলানা আব্দুল খালেক সাহেবের উদার ও প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে কবির জীবনে আমুল পরিবর্তন ঘটে। কবি এই মহান আধ্যাত্মিক সাধকের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েই বামপন্থি ও ইসলাম বিরোধী চিন্তা চেতনা থেকে বিমুক্ত হয়ে ইসলামের চির শাশ্বত কল্যাণময় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।[১] এ প্রসঙ্গে কবি-কন্যা সাইয়েদা ইয়াসমিন বানু লিখেছেন: ''প্রথম জীবনে আব্বা ছিলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত মনবতবাদী কমরেড, এম.এন. রায়ের শিষ্য। যিনি আটটি ভাষায় পন্ডিত ছিলেন। আব্বার জীবনে এক অচিন্তনীয় পরিবর্তনের মূলে যে মহান আউলিয়ার দোয়া ছিল, তিনি হচ্ছেন আব্বার পীর মরহুম অধ্যাপক আব্দুল খালেক– তৎকালীন যুগে ইংরেজি ও আরবীতে এম.এ ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট (গোল্ড মেডেলিস্ট)। বহু বিতর্কের মাধ্যমে আব্বাকে পরাস্ত করে সেদিন তিনি আব্বাকে বুঝিয়ে ছিলেন যে, ইসলামই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, যেখানে মানুষের জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান রয়েছে।[২] মাওলানা আব্দুল খালেক ছিলেন টেইলার হোস্টেলের সুপারিনটেন্ডেন্ট। তিনি লেখালেখী করতেন। কবি ফররুখ এখানে মাওলানার সন্নিধ্যে আসা যাওয়া করতেন এবং মাওলানার লেখাতে ভাষাগত পরিমার্জনে সাহায্য করতেন। মাওলানা আব্দুল খালেক রাসুল (সা.) এর উপর প্রণীত দুই খন্ডে সমাপ্ত একটি জীবনী গ্রন্থ নামঃ 'সাইয়েদুল মুরসালীন' প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থের পান্ডুলিপি ফররুখ আহমদ পাঠ করে এর ভাষা পরিমার্জনায় সহায়তা করেছিলেন। ফলে রাসুল (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরামের উপর কবিতা রচনার অনুপ্রেরণা তিনি তখনই লাভ করেন এবং একে একে সে কাজ সমাপ্ত করেন। 'সিরাজাম মুনীরা' রচনার পটভূমি এটাই।[৩]

সিরাজাম মুনীরা কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ কাল

প্রথম সংস্করণঃ সেপ্টেম্বর ১৯৫২। রচনাকাল: ১৯৪৩-৪৬। প্রকাশক ও মুদ্রাকর: তৈয়বুর রহমান, এম,এ তমদ্দুন প্রেস, লালবাগ রোড, পূর্ব পাকিস্তান। দাম: দু' টাকা আট আনা। ডিমাই সাইজ, পৃষ্ঠা-৮৮।[৪] সিরাজাম মুনীরা কাব্যের ভূমিকায় সৈয়দ আলী আহসান এর রচনা ও প্রকাশ কাল সম্পর্কে বলেন ''ফররুখ আহমদের 'সিরাজাম মুনীরা' প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে ঢাকায় । কিন্তু এই কাব্য গ্রন্থের কবিতাগুলো অনেক আগেই লেখা হয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'সাত সাগরের মাঝি'র পরে। তবে 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতাগুলো যে সময়, যে বছরগুলোতে লেখা হয়েছে অথবা যে মাস গুলোতে লেখা হয়েছে 'সিরাজাম মুনীরা' কবিতাগুলো তার পরে লেখা হয়েছে। কিন্তু সবই ১৯৪৩-১৯৪৬ এর মধ্যে।[৫] এই গ্রন্থটি 'সাত সাগরের মাঝি' প্রকাশের আট বছর পরে ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয়।[৬]

'সিরাজাম মুনীরা' গ্রন্থ পরিচিতি

'সিরাজাম মুনীরা' কাব্য গ্রন্থের দুটি অংশ। প্রথম অংশের নাম 'সিরাজাম মুনীরা মুহাম্মদ মুস্তফা' এবং 'খেলাফায়ে রাশেদীন' নামে দ্বিতীয় অংশ। কবির বিশ্বাসের জগৎ এখানে ধ্বনিতে হয়েছে। সিরাজাম মুনীরা মুহাম্মদ মুস্তফা অংশে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আবির্ভাব থেকে তাঁর প্রভাবের কাল বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে।[৭] গ্রন্থের শুরুতে সৈয়দ আলী আহসান কর্তৃক রচিত 'ভূমিকা' এবং মুহাম্মদ মতিউর রহমান কর্তৃক 'সিরজাম মুনীরা: প্রসঙ্গ কথা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ সংযোজন করা হয়েছে। 'সিরাজাম মুনীরা' কবি ফররুখ আহমদের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ।[৮] ১৯৫২ সালে সেপ্টেম্বর মোট ১৯টি কবিতা নিয়ে 'সিরাজাম মুনীরা কাব্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় তমদ্দুন প্রেস ৫০ লালবাগ, ঢাকা থেকে। এতে অর্ন্তভূক্ত যেসব কবিতা পূর্বে বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয় তার একটি বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো:[৯]

কবিতার নাম		পত্রিকা	সময় কাল
সিরাজাম মুনিরা	ঃ	মাসিক মোহাম্মদী	-
আব বকর সিদ্দিক	ঃ	মাসিক মোহাম্মদী	কার্তিক, ১৩৫০
উমর দারাজ দিন	ঃ	মাসিক মোহাম্মদী	পৌষ, ১৩৫০
ওসমান গণি	ঃ	সওগাত	পৌষ, ১৩৫০
শহীদে কারবালা	ঃ	সওগাত	পৌষ, ১৩৫৩
এন	ঃ	সওগাত	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২
এই সংগ্রাম	ঃ	সওগাত	শ্রাবণ, ১৩৫১
প্রেম পন্থী	ঃ	মাসিক মোহাম্মদী	-
অশ্রু বিন্দু	ঃ	মাসিক মোহাম্মদী	পৌষ, ১৩৫২
গাওসুল আজম	ঃ	মাসিক মোহাম্মদী	-

খাজানকশবন্দ	ঃ	মাসিক মোহাম্মদী	-
সুলতানুল হিন্দ	ঃ	মাসিক মোহাম্মদী	-
মৃত্যু সংকট	ঃ	মাসিক মোহাম্মদী	আশ্বিন, ১৩৫২
অভিযাত্রিকের প্রার্থনা	ঃ	মাসিক মোহাম্মদী	কার্তিক, ১৩৫২
মুক্ত ধারা	ঃ	মাসিক মোহাম্মদী	-
ইশারা	ঃ	মাসিক মোহাম্মদী	-

যার দস্ত মুবারকে গ্রন্থটি উৎসর্গ

কবি তাঁর 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যটি উৎসর্গ করেন পরম শ্রদ্ধাভাজন আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুল খালেক সাহেবের দস্তমুবারকে। উৎসর্গ পত্রটি রচিত হয় একটি আবেগপূর্ণ সনেট কবিতার আকারে। সনেটটি নিম্নরুপ[১০]

''যে আলোক শামাদানে জ্বলেছিল অম্লান বিভায়
অফুরান প্রাণৈশ্বর্যে সমুজ্জ্বল করি অন্ধকার
তারি আলোকণা বহি দীপ জ্বলে দীপাগ্নিতে; আর
প্রাণ পায় প্রাণের পাথেয়। নিশান্তের প্রত্যাশায়
জাগে সে অপূর্ব দ্যুতি প্রভাতের বর্ণ সুষমায়
নিরন্ধ্র রাত্রির বক্ষে, নিষ্প্রাণ মৃত্যুর কালঘুমে
(বিদ্যুৎ চমকে যেন–অথবা দুরন্ত সাইমুমে)
সিরাজাম মুনীরার জ্যোতির্লেখা মুক্ত ঝরোকায়।

তৌহিদী মশাল বহি চলে গেছে যারা যাত্রীদল
–পাথর চাপানো ভার, আঘাতের ভারী বোঝা টেনে,
অবিশ্বাসী শর্বরীর শিলা-বক্ষে সূর্যতীর হেনে
অগণ্য মৃত্যুর মাঝে নিষ্কম্প, নির্ভীক অচঞ্চল;
তাদের কাফেলা মাঝে নিঃসংশয় অভিযাত্রী জেনে
মানুষের মুক্তি স্বপ্ন রেখে যাই অম্লান সমুজ্বল।''

কবি তাঁর আধ্যাত্মিক গুরুকে 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যটি উৎসর্গ করে এ মহান সাধকের প্রতি যথার্থই তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন, এ দিক থেকে এ উৎসর্গ পত্রটির অপরিসীম গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে।

‘সিরাজাম মুনীরা’ কাব্যগ্রন্থের পর্যালোচনা

‘সিরাজাম মুনীরা’ কাব্যেগ্রন্থের প্রথম ও নাম কবিতা হলো ‘সিরাজাম মুনীরা মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম।’’ এটি বাংলা সাহিত্যের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। কবি এখানে ইতিহাসকে হুবহু তুলে ধরেননি বরং প্রতীকী ব্যঞ্জনায় কবি ইতিহাসকে জীবন্ত অভিব্যক্তি দান করেছেন। হযরতের আবির্ভাব কাল সম্পর্কে কবি বলেন।[১১]

‘‘পূর্বাচলের দিগন্ত-নীলে সে জাগো শাহান শাহের মত
তার স্বাক্ষর বাতাসের আগে ওড়ে নীলাম্রে অনবরত।’’

মহানবী (সা.) এর আগমনে বাতিল শক্তির ভিৎ প্রকম্পিত হয়। সমস্ত বিশ্ব চরাচরে এ মহামানবের আবির্ভাবে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। কবি গভীর আবেগ ও আনন্দ-মুগ্ধ চিত্তে এ ঐতিহাসিক মুহূর্তের বর্ণনা দিয়েছেন। কবির ভাষায়[১২]

‘কে আসে, কে আসে সাড়া পড়ে যায়,
কে আস, কে আসে নতুন সাড়া।
জাগে সুযুপ্ত মৃত জনপদ, জাগে শতাব্দী ঘুমের পাড়া।
হারা সম্বিত ফিরে দিতে বুকে তুমি আনো প্রিয় আবহায়াত,
জানি সিরাজাম মুনীরা তোমার রশ্মিতে জাগে কোটি প্রভাত,
তব বিদ্যুৎকণা স্ফুলিঙ্গে লুকানো রয়েছে লক্ষ দিন
তোমার আলোয় জাগে সিদ্দিক, জিন্নুরাইন, আলী নবীন,
ঘুম ভেঙ্গে যায় আল ফারুকের হেরি ও প্রভাত জ্যোতিস্মান
মুক্ত উদর আলোক তোমার অগণন শিখা পায় যে প্রাণ’

মুহাম্মদ (সা.) যে আলোক-বর্তিকা নিয়ে এ ধরাধামে আগমন করেছিলেন সে আলোক-বর্তিকা দিব্য নক্ষত্রের ন্যায় আজও পৃথিবীতে বিদ্যমান এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর আলোর দীপ্ত প্রবাহের ন্যায় অস্তিত্বমান। সে শুভ্র অমলিন আলোক-বর্তিকা দ্বারা মানবজাতি সর্বদা অনুপ্রাণিত হচ্ছে। কবির কণ্ঠে:[১৩]

‘সেদিন তমসা শিখরে নূরানী জয়তুন চারা করি রোপন
প্রোজ্জ্বল দীপ এলে সিরাজাম মুনীরা জাগায়ে অযুত মন।’’

আজকের সমাজে মনবতা যেখানে সর্বত্র ভূলণ্ঠিত সেখানে মানবতার পুনর্জাগরণ ঘটানোর প্রয়াস নি:সন্দেহে মহৎ প্রচেষ্টা। কবি বলেন:[১৪]

''দেখেছি তোমার মানবতা চলে সাথে জনগন বিপুল দেহ
ক্লোদাক্ত পথে ফোটায় মুকুল সাজালো তাদের ধরণী গেহ,
যে মরুতে জানি ফুল ফোটেনাকো, যেখানে ঊষর পৃথ্বীতল,
সেখানেও তুমি জাগালে শস্য, আনলে অঝোর ধারা বাদল।''

মানবতার এই মহান দিশারীর উদ্দেশ্যে ভক্তিপ্লুত কবি চিত্তের আবেগাকুল নিবেদন পেশ করে এ কাব্যের নাম কবিতাটি পরিসমাপ্ত হয়েছে।[১৫]

তাদের সঙ্গে সালাম জানাই হে মানবতার শাহানশাহ।
হে নবী! সালাম সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসুলুল্লাহ।

দ্বিতীয় পর্যায়ে খোলাফায়ে রাশেদীনের মহান চার ব্যক্তিত্বকে নিয়ে লেখা চারটি কবিতা। তারা হলেন আবু বকর সিদ্দিক (রা.), ওমর ফারুক (রা.), ওসমান গণি (রা.) ও আলী (রা.) তারা যথাক্রমে মহানবী (সা.) এর পরে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক হিসেবে বরিত হয়েছিলেন এবং ইসলামের ইতিহাসে খোলাফায়ে রাশেদীন বা চার খলীফা নামে পরিচিত হন।

চরিত্র মাধুর্য, মানবীয় গুনাবলী এবং ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ রুপে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে তাঁরা সকলেই ছিলেন অনন্য সাধারণ। ইসলামের প্রথম খলিফা দ্বীনের জন্য জাগতিক সকল সম্পদ আল্লাহর রাহে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে কবি বলেন:[১৬]

''সব সম্পদ নিখিল বিশ্বে বিলায়ে
ফিরাদৌসের পথে সে শান্তি হেলাল গিয়াছে মিলায়ে।
আজও আমি দেখি মহান নবীর চির-সাথীর
সমবেদনার সহানুভূতির অশ্রুনীর।
তবু সে সত্য পথে দুর্বার, দুর্জয় তার দু:সাহস
সব অসত্য মিথ্যার শিরে হানে বজ্র প্রবল রোষ।''

বিশ্ব ইতিহাসে ন্যায় পরায়ণ খলিফা এবং কঠোর ও সুযোগ্য শাসক হিসাবে সুপরিচিত ওমর ফারুক (রা.) ছিলেন মহানবীর (সা.) চরিত্রের আর এক প্রতিচ্ছবি। ইসলামের ন্যায় বিচার, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও মানব কল্যাণ হযরত ওমরের শাসনামলে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে। সে মহান ব্যক্তিত্বের উদ্দেশ্যে কবি বলেন:[১৭]

''শুকনো খোর্মা খেজুরে তৃপ্ত
সে খলিফাতুল মুসলেমীন
সত্য, ন্যায়ের মাঠে এনেছিল
সব মানুষের মুক্ত দিন।''

কবি অতীতের স্মৃতি চারণে মগ্ন, বর্তমানের অপছায়াঘেরা পৃথিবীর জীর্ণ, স্খলিত রূপ দেখে কবির মন ব্যথিত, দীর্ণ। তাই বিপুল আবেগ মথিত কণ্ঠে তাঁর উচ্চারণঃ[১৮]

'আজকে উমর পন্থী পথীর দিকে দিকে প্রয়োজন
পিঠে বোঝা নিয়ে পাড়ি দেবে যারা প্রান্তর প্রাণ-পণ,
ঊষর রাতের অনাবাদী মাঠে ফলাবে ফসল যারা,
দিক-দিগন্তে তাদের খুঁজিয়া ফিরিছে সর্বহারা।
যাদের হাতের দোররা অশনি পড়ে জালিমের ঘাড়ে,
যাদের লাথির ধমক পৌঁছে অত্যাচারীর হাড়ে,
আগুনের চেয়ে নিস্কলঙ্ক উদ্যত লেলিহান
যাদের বুকের পাঁজরে পাঁজরে বহে দরদের বান,
যারা খুলিয়াছে রুদ্ধ মনের সঙ্কীর্ণতা খিল
দারাজ দিলের আরশির ছায়া ধ'রছে দারাজ দিল্
সে ভয়ঙ্কর সেই প্রশান্ত মধ্যদিনের রবি,
এই মজলুম দুনিয়ার খা'ব নিত্য ধ্যানের ছবি।'

ইসলামের তৃতীয় খলিফা ওসমান (রা.) ছিলেন সেকালের অত্যতম শ্রেষ্ঠন ধনী। ঐশ্বর্যেরমোহ তাকে কখনোই মোহগ্রস্থ করতে পারিনি। কুরআন সংকলন, দানশীলতা এবং ইসলামকে বিজয়ী শক্তি রূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি ইতিহাসে চির স্মরনীয় হয়ে আছেন। এ মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কবির উক্তি:[১৯]

'সেই সত্য প্রতিষ্ঠার দিকে
বিশাল ভান্ডার তব ঈমানের পথ নিল চিনে।

ক'রে গেলে সীমাহীন দান,
বিশাল বিশ্বের বুকে চিরস্থায়ী ক'রে গেলে
মানুষের বিপুল সম্মান
কোরান একত্র করে রাখিল যে সত্যের সম্মান,
নিজের পরাণ দিয়ে রেখে গেলে পিরানের মান'।

চতুর্থ খলীফা আলী (রা.) এর বীরত্ব, ন্যায়পরায়নতার যেমন ছিলেন অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব আবার তেমনি ইসলামের তত্ত্বজ্ঞানেও তিনি ছিলেন অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী। তাঁর কিংবন্তীতুল বীরত্বের বর্ণনায় কবি বলেন:[২০]

''মরু আফতাব উড়ে চলে তার ঘোড়ার খুরে
তলওয়ার খাপে সূর্যের খা'ব প'ড়ছে ঝুরে
চমকালো ঐ দিগন্তে ওকি বজ্র-নার
অথবা আলীর শানিত দু'ধারী জুলফিকার?''

কবি আশাবাদী ও স্বপ্নচারী। তিনি মহাবীর আলীর (রা.) বীরত্বগাঁথা বর্ণনার সাথে সাথে ভবিষ্যতের নতুন উজ্জ্বল দিনের প্রত্যাশায় ব্যাকুল। কবির কণ্ঠে:[২১]

''সিংহ-নখর ছিঁড়ে ফেলে যথা ভীরু দুম্বার ঝুঁটি,
জানি খায়বার পড়েছে তেমনি তোমার আঘাতে লুটি
তিমির প্রান্তে দেখি হেলালের নবীন অভ্যুদয়,
দ্বীন ইসলাম পড়েছে ছড়ায়ে নিখিল বিশ্বময়
আরবী তাজীতে কাসেদ ছুটেছে নাই তার অবসর
রুদ্ধ দুর্গ দুয়ার ভেঙেছে মহাবীর হায়দার,
তার পথে দিয়ে আসিছে খালিদ, আসিছে তারেক, মুসা
সুবে সাদিকের বন্দরে ভেসে আসিছে রক্ত-ঊষা।
আট কেল্লার রুদ্ধ প্রকার আজিকে হয়েছে গুড়া,
কুল মখলুক হ'তে দেখা যায় আল-হেলালের চূড়া,
তার তক্‌বির শোনা যায়, পিছে ওঠে জনতার স্বর
আলী হায়দার! আলী হায়দার! আসে আলী হায়দার!''

ইসলামের ইতিহাসে কারবালা এক অতিশয় বিষাময় হৃদয়-বিদারক ঘটনা। এ ঘটনা যেমন লোম হর্ষক তেমনি ইসলামী আদর্শকে সমুন্নত রাখায় উদ্দেশ্যে মানবীয় সাহস ও প্রতিরোধের অতুলনীয়, অত্যুজ্বল উদাহরণ। এখানে 'খোলাফায়ে রাশেদীন' কবিতার পরেই 'শহীদে কারবালা' কবিতাটি সন্নিবেশিত করা তাৎর্যপূর্ণ। খেলাফতের আদর্শ অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যেই হযরত ইমাম হোসেন (রা.) শাহাদত বরন করেন। তাই চার খলিফার পরেই ইমামের সেই মহান স্মৃতি বিজড়িত কবিতাটির উপস্থাপন সবদিক দিয়েই সংগত হয়েছে। কবির কণ্ঠে:[২২]

''তীব্র ব্যথায় ঢেকে ফেলে মুখ দিনের সূর্য অস্তাচল
ডোবে ইসলাম রবি এজিদের আঘাতে অতল তিমির তলে।
কলিজা কাঁপায়ে কারবালা মঠে ওঠে ক্রন্দন লোহু সফেন
ওঠে আসমান জমিনে মাতন; কাঁদে মানবতা: হায় হোসেন।''

এরপর তিনটি কবিতা 'মন' 'আজ সংগ্রাম' এবং এই সংগ্রাম। এ তিনটি কবিতাই উত্থানকামী এক নবীন জাতির প্রাণ মূলে উৎসহ জাগানোর প্রয়োসে লিখিত।[২৩]

চতুর্থ পযায়ে নয়টি সনেট সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রথম দুটি সনেট নিগূঢ় আধ্যত্ন তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে।

'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যের সর্বশেষ কবিতার নাম 'ইশারা' এটি একটি দীর্ঘ কবিতা সমগ্র কাব্যের যেন এটা একটা উপসংহার।[২৪]

'সিরাজাম মুনীরা' সম্পর্কে বিশিষ্টজনের কতিপয় মন্তব্য

'সিরাজাম মুনীরা' সম্পর্কে সমালোচক মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ বলেন :[২৫] ''রোমান্টি কবি মানসের অধিকরী হওয়া সত্ত্বেও ফররুখ আহমদের কবিতায় রোমান্টিকতা প্রকাশ পেয়েছে এতিহ্য চেতনা ও স্বতন্ত্র সংস্কৃতিবোধকে কেন্দ্র করে। সিরাজাম মুনীরা' কাব্যগ্রন্থে বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং শব্দ চয়নের দিক থেকে নজরুল ইসলামের প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও, কবি ধর্ম ও কাব্যরীতির দিকে থেকে তিনি অনেকটা স্বাতন্ত্রের অধিকারী। 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যগ্রন্থেও ফররুখ আহমদের রোমান্টিক কবি কল্পনা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ গ্রন্থের কয়েকটি খন্ড কবিতায় ফররুখ আহমদের বলিষ্ঠ কল্পনা শক্তি প্রকাশ লাভ করেছে উপভোগ্য ও লাবণ্য মন্ডিত কবি ভাষায়। জীবনী ভিত্তিক কবিতা হলেও এতে লেগেছে কবি কল্পনা ও সৃষ্টিশীলতার স্পর্শ।''

ডক্টর আবু হেনা মোস্তফা কামালের ভাষায়: 'সাত সাগরের মাঝি' এবং সিরাজাম মুনীরা'র কবিতায় ফররুখ আহমদের মানস-গঠনের পরিচয় উজ্জ্বল রোমান্টিক স্বপ্নকেন্দ্রিক হয়েছেন তিনি। তাঁর এই সতর উত্তরণের মধ্যে একটি ব্যাপার লক্ষনীয়। যে মন একদা পৃথিবীর প্রাকৃতিক সৌন্দযের ভেতরে বাসনার মুক্তি দিতে চেয়েছিল, সামাজিক চেতনার প্রেরণার সেই মন সর্বশেষে রাষ্টীয় মতবাদের সান্নিধ্যে এসে খুঁজে পেলো ব্যাপ্তির ইংগিত।[২৬]

'সিরাজাম মুনীরা' সম্পর্কে আর একটি উদ্বৃতি 'There was indeed a mystical aspects to Farrukh Ahmad's mind. Serajum Mumar' Which means the effulgent damp is mainly concrned with states of conciousness beyond the ordianry. What however interests the average non-mystical reader is the tension in the poes nind, the donflict arising from his love of two kinds of beauty, the sensous and the supersensous. For unli many mystical poets. Farrakh Ahmad retains his interest in this world and would like to see it reshaped and remauled nearer to his heart's desire. his robust patriotism, his love of the qualities in farruk Ahmed which adds a radiance to his lyricism.'' (Dr. Syed Sajjad Hussain/Raffukh Ahmed. Pakistan Times 11.12.1966)[২৭]

বিশিষ্ট কবি সমালোচক আব্দুল মান্নান সৈয়দের ভাষায় : ''সাত সাগরের মাঝি'তে যা ছিল রুপকীকৃত ও প্রতিকীকৃত, যেন তারই বাস্তব পৃষ্ঠপট রচিত হলো 'সিরাজাম মুনীরা'য়। 'সাত সাগরের মাঝি তে যা ছিল রোমান্টিক যেন তারই ইতিহাস ভূমি দেখা দিল সিরাজম মুনীরায়।''[২৮]

অধ্যাপক মোহাম্মদ মতিউর রহমান বলেন :[২৯] ফররুখের 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্য বাংলা সাহিত্যের এক অসাধারণ সৃষ্টি। নজরুলের রাসুল প্রশাস্তি মূলক রচনা যেখানে আমাদের ভাবের সাগরে দোলা সৃষ্টি করে, ফররুখ সেখানে ভাবের সাথে সাথে আমাদের অকুণ্ঠিত আবেগ ও চৈতন্যকে নাড়া দেয়। ফররুখের 'সিরাজাম মুনীরা' পড়ে আমরা ভাবের সাগরে উদ্বেগ হই। তাই 'সিরাজাম মুনীরা' বাংলা সাহিত্যে এক অসাম্য কাব্যকৃতি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং চিরকাল রাসুল প্রেমিক কাব্যবোদ্ধাদের নিকট সমাদৃত হয়ে আসছে। 'সিরাজাম মুনীরা' ফররুখ আহমদের একটি উল্লেখযোগ্য কাব্য, এটি বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ সংযোজন।''

উপসংহার

এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, কবি-শিল্পীরা বাস্তব জগতের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও তাদের আর একটি নিজেস্ব জগত আছে। যে জগতের দ্রষ্টা ও স্রষ্ঠা তারা এবং অধিবাসিও তারাই। কবি ফররুখ আহমদ তাঁর যে কল্পনার জগৎকে রূপ রেখা বর্ণ-প্রতীকে দূরারত স্বপ্নের প্রতিচ্ছায়া করে 'সাত সাগরের মাঝি' তে উপস্থাপন করেছেন, সিরাজাম মুনীরা কাব্যে তা কেবল প্রতিচ্ছায়া হিসাবে নয়, ঐতিহ্য আর ইতিহাসের

সমুজ্জ্বল পরিচ্ছদে আবৃত হয়ে অনুপ্রেরণাদায়ী বাস্তব চিত্র হিসাবে তা ধরা দিয়েছে। তাই সমকালীন পাঠক গভীর আবেগ ও আনন্দে তা সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছে, ভবিষ্যতেও তা এভাবেই আদৃত হবে বলে আশা করা যায়।

তথ্যসূত্র

১। অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ প্রতিভা*, পৃ. ২৫৬।

২। শাহবুদ্দিন আহমদ সম্পাদিক, *ফররুখ আহমদ: ব্যক্তি ও কবি*, পৃ.২৮১ ও প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭।

৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮।

৪। *কবি ফররুখ আহমদ জীবন ও সাহিত্যবিষয়ক তথ্যপুঞ্জি*, মুহাম্মদ মতিউর রহমান, পৃ. ৩৯।

৫। ফররুখ আহমদ, *সিরাজাম মুনিরা*, পৃ. ৯।

৬। *ফররুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য*, মুহাম্মদ মতিউর রহমান-সম্পাদিত, পৃ. ২৮৫।

৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫।

৮। ফররুখ আহমদ, *সিরাজাম মুনিরা*, পৃ. ১৩।

৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬ ও অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ প্রতিভা*, পৃ. ২৫৬।

১০। ফররুখ আহমদ, *সিরাজাম মুনিরা*, পৃ. ২৬।

১১। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

১২। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

১৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

১৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

১৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

১৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

১৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

১৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

১৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

২০। প্রাগুক্ত, প্র. ৫২।

২১। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

২২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

২৩। অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ প্রতিভা*, পৃ. ২৮১।

২৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১।

২৫। ফররুখ আহমদ, *সিরাজাম মুনিরা*, পৃ. ২০।

২৬। অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ প্রতিভা*, পৃ. ২৬৮।

২৭। ফররুখ আহমদ, *সিরাজাম মুনিরা*, পৃ. ২১।

২৮। *ফররুখ আহমদ রচনাবলী*, আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, ১ম খন্ড, ভূমিকা, পৃ. ১৪।

২৯। অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ প্রতিভা*, পৃ. ২৭১-২৭২।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ)

উভয়ের রচনাবলী মাঝে বিদ্যমান ইসলামী চেতনার তুলনামূলক আলোচনা

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সাহিত্যের ইতিহাসে ইসলামী বিষয় অবলম্বনে কাব্য রচনায় যে সকল কবি-সাহিত্যিক স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল কবি প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন তাদের মধ্যে আরবী সাহিত্যে আহমাদ মুহাররাম ও বাংলা সাহিত্যে কবি ফররুখ আহমদের নাম স্ব-বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইসলামী চিন্তা চেতনায় যেমন সিক্ত হয়েছে আহমাদ মুহাররামের কাব্য ভান্ডার তেমনি মুসলিম তাহজীব ও তমদ্দুনের কথা অপূর্ব শিল্প দক্ষতায় প্রকাশ করেছেন বাংলার কবি ফররুখ আহমদ। তাঁরা উভয়ই ছিলেন কিছু কালের সমসাময়ীক কবি। কবি ফররুখ আহমদ যেমন বাংলা সাহিত্যের একজন প্রধান কবি তেমনি আহমাদ মুহাররামকেও কোন কোন আরবী ভাষা পন্ডিত আরবী সাহিত্যের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে স্থান দিতেও কার্পণ্য করেননি। উভয়ের রচনাশৈলী ও প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে ভাষা ব্যবধানে স্বাতন্ত্র্য থাকলে ও বিষয়বস্তুতে অনেকটা এক। তাইতো আহমাদ মুহাররাম কে বলা হয় 'শায়েরুল আরুবা ওয়াল ইসলাম' তথা আরব জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী ভাবধারা প্রবক্তা তেমনি কবি ফররুখকে বলা হয় বালা সাহিত্যে 'মুসলিম রেনেসাঁর কবি'। উভয়ই ছিলেন মানবতাবাদী কবি। আধুনিক বাংলা কবিতার আঙ্গিক ও ভাষার সঙ্গে সমঞ্জস্য রক্ষা কর কবি ফররুখ যেমন ইসলামী ঐতিহ্যের নবরুপায়ন ঘটিয়ে সৃষ্টি করেছেন তাঁর অমর কাব্য-গ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' ও 'সিরাজাম মনীরা' তেমনি তীব্র ইসলামী চেতনার বহি: প্রকাশ ঘটিয়ে আহমাদ মুহাররামও করেছেন এক অমর কীর্তি 'দিওয়ানু মাজদিল ইসলাম'। নিম্নে উভয় কবির রচনাবলীর আলোকে ইসলামী চেতনার নানা দিক আলোচনা করা হলো।

আহমাদ মুহাররাম ও ফররুখ আহমদের মধ্যে ইসলামী চেতনার সূত্রপাত

বাল্যকালে মক্তবে ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে যে কবির শিক্ষা জীবনের সূত্রপাত, পরিণত বয়সে তাঁর লেখনী থেকে ইসলামী চেতনার বহিপ্রকাশ ঘটবে এটাই স্বাভাবিক।[১] তাইতো আহমাদ মুহাররামকে বলা হয় 'শায়রুল আরুবা ওয়াল ইসলাম' তথা আরব জাতীয়তাবাদ ও ইসলামের কবি।[২] অপর পক্ষে কাব্য রচনার প্রথম দিকে ফররুখ আহমদ ছিলেন এক অস্থির-চিত্ত বোহেমিয়ান ধরনের যুবক। বামপন্থী চিন্তা-চেতনা ও বাম কবিদের সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা ছিল গভীর। তাঁর সে সময়কার কোন লেখায় ইসলামী ভাবধারা ও চিন্তা-চেতনার কোন প্রতিফল লক্ষ্য করা যায় না। পরবর্তীতে কবির পীর মরহুম অধ্যাপক আব্দুল খালেকের সান্নিধ্যে এসে কবির চিন্তা চেতনার পরিবর্তন ঘটে। তিনি ছিলেন তৎকালীন যুগে ইংরেজি ও আরবিতে এম.এ ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট (গোল্ড মেডেলিস্ট)। সে দিন

তিনি কবিকে খুব বুঝিয়ে ছিলেন। ফলে কবির জীবনে আমুল পরিবর্তন ঘটে।[৩] এ সম্পর্কে অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী লিখেছেন ''এ-সময় (পয়তাল্লিশের মাঝামাঝি) ফররুখ ভাই দ্রুত রূপান্তরিত হচ্ছিলেন। তাঁর সম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্তাই তখন ভেঙে-চুরে নতুন রুপ নিতে চলছে। এক কথায় তখন তার কনভার্শন এর শেষ পর্যায়। যিনি ফররুখ ভাইয়ের এই কনভার্শনের মুখ্য পরুষ সেই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিটি মাওলানা আব্দুল খালেক।''[৪]

ইসলামী চেতনার তুলনামূলক পর্যালোচনা

মুহাম্মদ (সা.) এর আবির্ভাব

ইসলামের বার্তা বাহক হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আগমন প্রসঙ্গে আহমাদ মুহাররাম বলেন:[৫]

إملإ الإرض يا محمد نورا واغمر الناس حكمة والدهورا

حجبتك الغيوب سرا تجلى يكشف الحجب كلها والستورا

عب سيل الفساد في كل واد فتدفق عليه حتى يغورا

جئت ترمى عبابه بعباب راح يطوى سيوله والبحورا

'হে মুহাম্মদ। তুমি নূর দ্বারা এই পৃথিবীকে পরিপূর্ণ কর। যুগ ও যুগের মানুষকে হেকমত দ্বারা পরিপূর্ণ কর। অদৃশ্য শক্তি তোমাকে রহস্যাবৃত করে রেখেছিল। অত:র তা স্পষ্ট হয়ে গেল এবং সকল পর্দা ও আবরণকে উন্মোচিত করেদিল। অনিষ্ঠতার প্রবাহ সকল উপত্যকায় প্রবল হয়েছে, ফলে তা উপত্যাকর উপর দিয়ে জোরে প্রবাহিত হয়েছে, অনন্তর তা ডুবে গেছে। তুমি আগমন করে বিবাদের তরঙ্গের মুকাবালায় (সত্যের) তরঙ্গ নিক্ষেপ করেছ, ফলে অসত্যের প্রবাহ ও তার সাগর ভাঁজ হতে শুরু করেছে।

হযরতের আবির্ভাবের বর্ণানায় কবি ফররুখ আহমদ বলেন-[৬]

''কে আসে, কে আসে সাড়া প'ড় যায়
কে আসে, কে আসে নতুন সাড়া।
জাগে সুষুপ্ত মৃত জনপদ জাগে শতাব্দী ঘুমের পাড়া।
হারা সম্বিত ফিরে দিতে বুকে তুমি আনো প্রিয় আবহায়াত,
জানি সিরাজাম-মুনীরা তোমার রশ্মিতে জাগে কোটি প্রভাত,
তব বিদ্যুৎকনা-স্ফলিঙ্গে লুকানো র'য়েছে লক্ষ দিন,
তোমার আলোয় জাগে সিদ্দিক, জিন্নুরাইন, আলী নবীন,
ঘুম ভেঙে যায় আর-ফারুকের-হেরিও প্রভাত জ্যেতিস্মান
মুক্তি উদার আলোক তোমার অগনন শিখা পার যে প্রাণ।''

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী আবির্ভাব কালে পৃথিবীর অবস্থা

তৎকালীন আরব বিশ্ব ছিলো অন্ধকারে নিমজ্জিত, আল্লাহকে ভূলে সর্বত্র ছিলো পাপের ছড়াছড়ি। মুর্তীপুজায় বুদ হয়েছিল তাদের ধর্মীয় জীবন এ প্রসঙ্গে আহমাদ মুহাররাম বলেন-[৭]

أنكر الناس ربهم وتولوا يحسبون الحياة إفكا وزورا

أين من شرعة الحياة أناس جعلوا البغىشرعة والفجورا؟

تلك أربابهم: أتملك أن تنـ ـفع مثقال ذرة أو تضيرا؟

قهروها صناعة، اعجب الأر باب ما كان عاجزا مقهورا

ما لدى اللات أو منة أو لعز ى غناء لمن يقيس الأمورا

'মানব জাতি তাদের প্রভূকে অস্বিকার করেছে এবং তারা বিমুকতা অবলম্বন করেছে। তারা মনে করে জীবনটা অবাস্তব ও মিথ্যা। ধর্মীয় জীবন বিধান ছেড়ে মানুষ কোথায় যাবে? তারা এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও অন্যায় করেছে। ঐ (প্রতিমাগুলো) তাদের প্রভূ। ঐ গুলো কি বিন্দু পরিমান উপকার কিংবা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে। তারা তো ঐ প্রতিমা গুলোকে প্রতিমা হতে বাধ্য করেছে। ঐ গুলো কতইনা আশ্চর্য জনক মা'বদ। যারা নিজেরাই অক্ষম ও বশীভূত। যে ব্যক্তি ধর্মীয় বিষয় সমূহিকে তুলনা করছে সে জানতে পেরেছে যে লাত, মানাত ও ওজ্জার কাছে কোন প্রাচুর্য নেই। সত্যদ্বীন আগমন করেছে ফলে আল্লাহর রাসুল তার নির্দেশনা সম্বলিত ঝান্ডার পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেছেন।

''আরব বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে কবি ফররুখ আহমাদ বলেন-[৮]

'মনে জাগে সেই ঘনতর বিষ, বিশ্ব আরব গগনে মেঘ
অত্যাচারীর হাতে পীড়িতে সে কী দুর্ভোগ, কী উদ্বেগ।
মূক পশু সম মার খেয়ে মরে খরিদা গোলাম বাঁদর দল
শিশু হত্যার মৌসুমী যেন, পাপে কেঁপে ওঠে জল স্থল
শরাব শোনিতে মাতাল মানুষ মানবতাহীন নর্দামায়
পুরীষ মাখায় শুভ্র ললাটে কদর্যরুচি পশুর প্রায়,
নাস্তিকতায়, বহুত্ববাদে, ব্যাভিচারে ছানি প'ড়েছে চোখে
কাবাগৃহ তারা সাজায়ে পুতুলে অন্ধের মত কপাল ঠোকে।''

মক্কা বিজয়

মক্কা বিজয় ইসলামের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এটি ৮ম হিজরীতে সংঘটিত হয়। এ প্রসঙ্গে আহমাদ মুহাররাম বলেন-[৮]

الله أكبر، جاء الفتح، وابتهجت للمؤمنين نفوس، سرها وشقى

مشى النبي يحف النصر موكبه مشيعا بجلال الله مكتفيا

أضحيى أسامة من بين الصحاب له ردفا، فكان أعز الناس مرتدفا

لم يبق إذ سعطت أنوار غرته مغنى بمكة إلا إهتزأ ووجفا

'আল্লাহ মহান, বিজয় সম্পন্ন হয়েছে। ফলে বিশ্বাসীদের অন্তর প্রফুল্ল হয়েছে। আর বিজয় আনন্দ বিশ্বাসীদের অন্তর ভরে দিয়েছে এবং কাফিরদের অত্যাচারে জর্জরিত ক্ষত বিক্ষত হৃদয়কে আরোগ্য করে দিয়েছে। খোদার মহিমায় নবী (সা.) সহযোগী ও সঙ্গী পরিবেষ্টিত অবস্থায় (বিজয়ের জন্য) চলছেন। আর তাঁর অভিযাত্রী দলকে খোদার সাহায্য বেষ্টন করে রেখেছে। সাহাবাদের মাঝে উসামা বিন যায়েদ রাসূলের সহযাত্রী হলেন। আর তিনি মানুষের মাঝে সবচেয়ে সম্মানিত সহযাত্রী হিসেবে পরিগণিত হলেন। যখন রাসূলের (সা.) উজ্জ্বল আলো প্রকাশিত হল। তখন সকল মুসলিম গৃহ (আনন্দে) আন্দোলিত হল এবং কাফিরদের গৃহ ভয়ে প্রকম্পিত হল।

''এ প্রসঙ্গে কবি ফররুখ আহমদ বলেন-[৯]

''জোড়াতালি দেওয়া, রোদে ভেঙ্গে পড়া নির্যাতিতের ভাঙ্গা মিছিল
তোমার হাতের ইশারায় খোলে মরুদুর্গের সকল খিল।
তারপর এল তোমার প্রভূর প্রতিশ্রুত সে জয়ের দিন
মহাগৌরবে এল ফতহুম মুবিন–শান্তি দীপ্ত দিন
দীর্ঘ রাতের প্রতীক্ষার ঐ মরুকন্টকে রঙিন লাল
ফুটলো গোলাব দিক দিগন্তে আজান ফুকারে সাথী বেলাল।
অটল তোমার ধৈর্য হে নবী! সুন্দরতম সে অপরুপ,
তোমার আলোয় জেগে ওঠে কোটি সুদূর প্রাচীন অন্ধকূপ,''

বদরের যুদ্ধ

ইসলামের ইতিহাসে ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে বদর যুদ্ধ অন্যতম। এই যুদ্ধে মুহাম্মদ (সা.) স্বয়ং উপস্থিত থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে আহমাদ মুহাররাম বলেন[১০]

أريت إذ هزم النبي جموعهم فكأنما هزم البغاث المضرح

هي حفنة للمشركين من الحصى خف الوقور لها وطاش المرجح

مثل الثميلة من مجاجة نافث وكأنما هي صيب يتبذح

''তুমি কি দেখনি যখন নবী (সা.) তাদের (কাফিরদের) দলটিকে পরাজিত করলেন। এ যেন বাজপাখি শকুনের দলকে পরাজিত করল (অর্থাৎ ক্ষুদ্র একটি বাহিনী বৃহৎ একটি বাহিনীকে পরাজিত করল)। এই পরাজয় মুশরিকদের জন্য এক মুষ্ঠি নুড়ি পাথরের সদৃশ্য ছিল। যার ফলে (তাদের ঐক্যের) ফাটল সহজতর হয়ে গেল এবং বিজয় লক্ষ্যচ্যুত হয়ে গেল।''

এ প্রসঙ্গে ফররুখ আহমদ বলেন:[১১]

''বদর-ওহোদ মরু প্রান্তরে ঘিরে যবে হানে মৃত্যুতীর
তখনো সকল মৃত্যুর মাঝে সিপাহ্ সালার রইলে স্থির,
লক্ষ মৃত্যু উদ্যত তবু হে মহাসেনানী পাওনা ভয়,
বিস্মিত চোখে আলী হায়দার দেখে ঐ তনু জ্যোতির্ময়,
হামজা শিহরে পুলকিত বীর জাগলো কি ফের অস্ত্র তার
দু'হাতে দু'ধারী তলওয়ার নিয়ে হাঁক, হে সেনানী! জয় তোমার।

তথ্যসূত্র

১। মুহাম্মদ ইবনে সা'দ ইবনে হুসাইন, *আল-আদব আল-আরবী ওয়া তারীখুহু* (আল-আছর, আল-হাদীছ), পৃ. ৬২।

২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

৩। অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ প্রতিভা*, পৃ .৫৬-৫৭।

৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭।

৫। আহমাদ মুহাররাম, *দিওয়ানু মাজদিল ইসলাম*, পৃ. ৪৫।

৬। ফররুখ আহমদ, *সিরাজাম মুনিরা*, পৃ. ২৭।

৭। আহমাদ মুহাররাম, দিওয়ানু মাজদিল ইসলাম, পৃ. ৪৬।

৮। ফররুখ আহমদ, *সিরাজাম মুনিরা*, পৃ. ২৮।

৯। http://ar.wikipedia.org/wiki

১০। ফররুখ আহমদ, *সিরাজাম মুনিরা*, পৃ. ৩৩।

১১। আহমাদ আব্দুল লতীফ আল-জাদা ওয়া হুসনী আদ্হাম জারার, *শু'আরা আল-দা'ওয়াত আল-ইসলামিয়্যা ফি আল-আসর আল-হাদীছ*, পৃ. ৯৬।

১২। ফররুখ আহমদ, *সিরাজাম মুনিরা*, পৃ. ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বিশ্বের অধিকাংশ ভাষার সাহিত্যকর্মে ইসলামী সাহিত্য একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ভাষা ব্যবধানে আরবী ও বাংলা ভাষায় এর ব্যত্যায় ঘটেনি। এ দুই ভাষার অসংখ্য কবি সাহিত্যিকগণ স্ব-স্ব ভাষায় ইসলামী সাহিত্য রচনায় ব্রত হয়েছেন। আরবী সাহিত্যে ইসলামী সাহিত্যের চেরাগ সেই যে চৌদ্দশত বছর আগে হাসসান ইবনে ছাবিত, লবীদ ইবনে রাবী'আ, কা'ব ইবনে যুহায়র, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা প্রমুখ কবিদের মাধ্যমে প্রজ্বলিত হয়েছিল, কালের ব্যবধানে আধুনিক যুগের সমৃদ্ধ পর্বে ম্রিয়মান সেই আলোক প্রদীপে যৎসামান্য জ্বালানী দিয়ে মৃত প্রায় সাহিত্যের এই শাখাটির অপমৃত্য রোধ করেছিলেন আমাদের কবি আহমাদ মুহাররাম। আর তারই ফলস্বরুপ আরবী সাহিত্যের কাব্যঙ্গানে তাঁর অপরাপর সাহিত্য কর্মের ন্যায় চেহারা পেল 'দিওয়ানু মাজদিল ইসলাম' নামক মহাকাব্যটি। এটি কবির রাসূল প্রমের উজ্জ্বল নির্দশন। অপরদিকে বাংলা সাহিত্যের শুরু থেকেই প্রায় প্রত্যেক মুসলিম কবিই রাসূল, ইসলাম, আল্লাহ-প্রসংশামূলক কবিতা, গান, কাব্য ইত্যাদি রচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন: শাহ মুহম্মদ সগীর, আব্দুল হাকিম, ফকির গরিবুল্লাহ, মীর মোশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ মোজাম্মেল হক, মুনশি মেহেরুল্লাহ, কাজী নজরুল ইসলাম, বেনজীর আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান, ফররুখ আহমদ প্রমুখ। কবি ফররুখ আহমদ তাঁর কাব্য জীবনের শুরু থেকেই রূপক-উপমা-প্রতীকের ব্যবহারে সিদ্ধাহস্ত। কারণ রূপক-উপমার মাধ্যমে কোন কিছু প্রকাশ করলে তা অনেক গভীর, তাৎপর্যপূর্ণ ও ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে। তাতে ভাব কল্পনার সীমাহীন বিস্তার ঘটে। আর এ পন্থা অবলম্বন করেই কবি ফররুখ আহমদ রচনা করেছেন 'সাত সাগরের মাঝি' ও 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্য গ্রন্থদ্বয়। 'সাত সাগরের মাঝি' তে স্বপ্ন কল্পনার দিকটা অধিক অন্যদিকে 'সিরাজাম মুনীরা'য় ইতিহাস চেতনায় প্রধান্য। এই উভয় কবি ছিলেন ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত মর্দে মুমিন এবং তাদের লেখনী ছিল ইসলামী চেতনায় জাতিকে জাগিয়ে তোলার হাতিয়ার। তারা উভয়ই ছিলেন সমসায়িক কবিদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীভূক্ত তাতে কোন সন্দেহ নেই। জীবদ্দশাতে তাদের যথার্থ কদর হয়নি। এই মহান কবিদের সম্পর্কে আরো দীর্ঘ গবেষণা হওয়ার দাবী রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপুঞ্জি

আরবী তথ্যসূত্র

১। আহমাদ আব্দুল লতীফ আল-জাদা ওয়া হুসনী আদ্হাম জারার, *শু'আরা আল-দা'ওয়াত আল-ইসলামিয়্যা ফি আল-আসর আল-হাদীছ,* (লেবানন, বৈরুত: মুআচ্ছাছাহ আল-রিসালা, ১৪০১ হি/১৯৭১ইং)।

২। আহমাদ কাব্বিশ, *তারীখ আল-শি'র আল-আরবী আল-হাদীছ,* (লেবানন, বৈরুত: দার আল-জীল, ১৩৯১/১৯৭১)।

৩। আহমাদ মুহাররাম, *দিওয়ানু মাজদিল ইসলাম,* (কুয়েত: মাকতাবাতুল ফালাহ, ১৯৮২), ১ম সংস্করণ।

৪। আহমাদ তাম্মাম, *আহমাদ মুহাররাম:* রিসালাত শা'ইর (প্রবন্ধ), আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১২ তম সংখ্যা।

৫। আবু তাহির মোহাম্মদ মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬)।

৬। *আল-বালাগাত ওয়া আল-নকদ লিস্ সাফফিস ছালিছ ছানভী*, সৌদি আরব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৭। ড. আহমদ আলী, *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস* (চট্টগ্রাম: আল-আকিব প্রকাশনী, ২০০৪), ১ম খন্ড।

৮। আব্দুল বাসিত বদর, *আল মুকাদ্দিমাত লিন নাযারিয়্যাত আল-আদব আল-ইসলামী*, (জিদ্দা: দার আর-শারুক, ১৯৮৬ইং), ৫ম খন্ড।

৯। *আল-মুনজিদ,* (লেনাবব, বৈরুত: দার-আল মাশরিক পাবলিশার্স, ১৯৭৫ইং)।

১০। আল-কিন্দী, *তারীখু উলাতি মিশর,* কায়রো।

১১। ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, *আসহাবে রাসূলের কাব্য প্রতিভা,* (ঢাকা: আহসানিয়া পাবলিকেশন, ২০০৩), ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

১২। ওমর আল দাসুকি, *ফি আল-আদাব আল-হাদীস,* (লেবানন, বৈরুত: দার্ াল-ফিকর, ৭ম সংস্করণ) ২য় খন্ড।

১৩। ড. আহমদ আলী, *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস,* (চট্টগ্রাম: আল-আকিব প্রকাশনী, ২০০৪), ১ম খন্ড, পৃ. ১৬-১৭।

১৪। ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, *আসহাবে রাসূলের কাব্য প্রতিভা*, (ঢাকা: আহসানিয়া পাবলিকেশন, ২০০৩)।

১৫। ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা, *নাহবু মাজহাবুল ইসলামীয়্যা ফি আল-আদব ওয়া আল-নক্‌দ*, (হিন্দ, লৌক্ষ: আল-আমানুত আল-আম্মাহ লি নাদওয়াতিল আদব আল-ইসলামী আল-আ'লামিয়্যা, ১৯৮১ইং)।

১৬। সায়্যেদ কুতুব, ফি আল-তারীখ : *ফিকরতুন ওয়া মিনাহিজ*, (লেবানন, বৈরুত: দার আল-মা'আরিফ ১৯৮৬ইং) ৫ম খন্ড।

১৭। গোলাম সামাদানী কোরায়শী, *আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭ইং), ১ম সংস্করণ ।

১৮। ড. ত্বাহা হুসাইন, *আল-আইয়্যাম*, (২য় প্রকাশ, ১৩৫২হি./১৯৯৩ইং), ১ম খন্ড।

১৯। ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৫)।

২০। ডা. নাজিব কিলানী, আ'ফাক আল-আদব আল-ইসলামী, (লেবানন: বৈরুত মুআচ্ছাছা আল-রিসালা, ১ম সংসকরণ, ১৯৮৫ইং)।

২১। ড. মুহাম্মদ গুনাইমী হেলাল, *আল-আদাব, আল-মুকারিন*, (মিমর দার আল-নাহদাতি)।

২২। ড. মোঃ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, (ঢাকা: রিয়া প্রকাশীন, ২০০৬), ৩য় সংস্করণ।

২৩। ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আরব মনীষা, (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী),

২৪। মুহাম্মদ ইবন সা'দ ইবন হুসাইন, *আল-আদব আল-আরবী ওয়া তারীখুহু (আল-আছর আল-হাদীছ)*, ৫ম সংস্করণ।

২৫। মুহাম্মদ ইবনে সা'দ ইবন হুসাইন, *আল-আদব আল-হাদীছ তারীখ ওয়া দিরাসাত*, (রিয়াদ: দার আব্দুল আযীয আল হুসাইন, ১৯৯৭), সপ্তম সংস্করণ, ১ম খন্ড।

২৬। ড. মোহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, আহমাদ মুহাররাম : *আশ শাইরুল ওতানী আল-ইসলামী ওয়া ইসলাহাতুহু আল-ইজতিমাইয়্যাহ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আরবী বিভাগ, ৪র্থ সংখ্যা।

২৭। ড. মুস্তফা মাহমূদ ইউনূস, *আদব আল-দা'ওয়াহ আল-ইসলামিয়্যা*, (কায়রো: মাতবাআতু কাসিদিল খায়র, বা, তা)।

২৮। http://ar.wikipedia.org/wiki

২৯। ড. মুহাম্মদ মান্দুর, *আল-আদাব ওয়া ফুনুনুহু* (মিশর: দায় আল-নাহদাতি)।

৩০। ড. মুকতাদা হাসান আযহারী, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, সম্পাদক: ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান, (রাজশাহী: মুহাম্মদী সাহিত্য সংস্থা, ১৯৮৫), ২য় খন্ড ।

৩১। ড. মুকতাদা হাসান আযহারী, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, সম্পাদক: ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান, (রাজশাহী: মুহাম্মদী সাহিত্য সংস্থা, ১৯৮৫), ২য় খন্ড, পৃ. ১০৭-১১০।

৩২। ম্যাগাজিন, *আল-মাজাল্লাতুল আরবিয়্যাহ*, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪র্থ ও ও ১২তম সংখ্যা।

৩৩। শ্রী চন্দ্র দাস, *সাহিত্য সন্দর্শন* (ঢাকা: বর্ণ বিচিত্র, ১৯৯৪)।

৩৪। http://www.ai.jazirah.com.sa/aleem//esson-2688.html

৩৫। ড. শাওকী দ্বায়ফ, *দিরাসাত ফি আল-শি'র আল-আরাব আল-মু'আছির*, (মিশর: দারুল মা'আরিফ, ১৯৫৯)

৩৬। *সীরাত ইবন হিশাম*, অনুবাদক: আকরাম ফারুক, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯ইং), চতুর্দশ প্রকাশ।

৩৭। ড. সা'দ আবুর-রিদা, *আল-আদব আল-ইসলামী: কদিয়্যাতুল ওয়া বিনাউন*, (জিদ্দা: দারুল মা'আরিফাহ, ১৯৮২ইং)।

৩৮। সৌদি আরব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, *আল-বালাগাত ওয়া আন-নকদ লিস্ সাফফিস ছালিছিছ ছানাভী*, ১৯৮৩ইং।

৩৯। হান্না আল-ফাখুরী, *তারীক আল-আদব আর-আরবী*, (ইরাক: মাতবায়াত আল-বুলসিয়্যাহ)।

বাংলা তথ্যসূত্র

১। সৈয়দ আলী আহসান, '*ফররুখ আহমদের সাত সাগরের মাঝি*' ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, অক্টোবর ২০০০, ২য় সংখ্যা।

২। আবুল হাশেম, *আমার ছাত্র ফররুখ*, (ঢাকা: ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ২০০৫), একাদশ সংখ্যা ।

৩। আব্দুর রশীদ খান, *দুঃসময়ের দিশারী : কবি ফররুখ আহমদ*, (ঢাকা: ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ২০০৬), ত্রয়োদশ সংখ্যা।

৪। সৈয়দ আলী আহসান, *ফররুখ আহমদের সিরাজাম মুনীরা*, ভূমিকা, 'সিরাজাম মুনীরা' (ঢাকা: ফররুখ, ২০০০), একাডেমী সংস্করণ ।

৫। সৈয়দ আলী আহসান, *ফররুখ আহমদের 'দিলরুবা'*, (ঢাকা: ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ২০০১), ৪র্থ সংখ্যা।

৬। সৈয়দ আলী আহসান, *ফররুখ আহমদ-এর 'হাতেম তায়ী'*, (ঢাকা: ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ২০০২), ৫ম সংখ্যা।

৭। ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)।

৮। ফররুখ আহমদ, *সিরাজাম মুনিরা*, (ঢাকা: ফররুখ একাডেমী, ২০০০)।

৯। ফররুখ আহমদ, *সাত সাগরের মাঝি*, (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ২০১৪), তৃতীয় মুদ্রণ।

১০। *ফররুখ আহমদ (সংকলন)*, (ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুকস সোসাইটি লিঃ, ২০১৬), ২য় প্রকাশ।

১১। *ফররুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য*, মুহাম্মদ মতিউর রহমান-সম্পাদিত, (ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০১৫), ১ম খন্ড।

১২। *ফররুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য*, মুহাম্মদ মতিউর রহমান-সম্পাদিত, (ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০১৭), ২য় খন্ড।

১৩। *ফররুখ আহমদ রচনাবলী*, আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, ১ম খন্ড, ভূমিকা।

১৪। *ফররুখ একাডেমী পত্রিকা*, সম্পাদক: মোঃ মতিউর রহমান, (ঢাকা: জুন-অক্টোবর-২০১৩) ২৫তম সংকলন ।

১৫। *কবি ফররুখ আহমদ জীবন ও সাহিত্যবিষয়ক তথ্যপুঞ্জি:* মুহাম্মদ মতিউর রহমান, (ঢাকা: ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন ২০১৮), প্রথম প্রকাশ।

১৬। অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ প্রতিভা*, (ঢাকা: ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন ও কথাশিল্প প্রকাশন, ২০১৭), ৩য় প্রকাশ।

১৭। অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ফররুখ আহমদের সাত সাগরের মাঝি*, (ঢাকা: এস আর প্রকাশন, ২০১৫), প্রথম প্রকাশ।

১৮। মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য*, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০২)।

১৯। ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *ফররুখ আহমদের সিরাজাম মুনীরা কাব্য*, (ঢাকা: ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ২০০৩), ৭ম সংখ্যা।

২০। ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *ফররুখ আহমদের 'মুহূর্তের কবিতা'*, (ঢাকা: ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ২০০১), ৪র্থ সংখ্যা।

২১। মুকুল চৌধুরী, *ফররুখ আহমদের ইসলামী গান-গজল*, (ঢাকা: ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ২০১২), ২২তম সংখ্যা।

২২। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, *ফররুখ আহমদের গল্প: তাঁর সৃজনশীলতার স্বরুপ*, (ঢাকা: ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ২০০৫), ১২তম সংখ্যা।

২৩। সাইয়েদা ইয়াসমিন বানু, *আব্বাকে যেমন দেখেছি*, ঢাকা ডাইজেস্ট, ১৯৭৪।

২৪। সানাউল্লাহ্ নূরী, *ব্যক্তি ও কাব্য-শিল্পী ফররুখ*, (ঢাকা: ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ২০০১), ৩য় সংখ্যা।

২৫। শাহবুদ্দিন আহমদ সম্পাদিত, *ফররুখ আহমদ : ব্যক্তি ও কবি*, প্রথম প্রকাশ।

ইংরেজী তথ্যসূত্র

1. P.K. Hitti, Histroy of the Arabs (London-1951).
2. H.A.R Gibb and Islamic Society and the West (London, 1960).
3. The new Encyclopedia Britannica, Volume-4